তোমার বসন্তদিনে

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

আশা প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : মহালয়া ১৩৭১, সেপ্টেম্বর,
প্রকাশক : শীলা ভট্টাচার্য, আশা প্রকাশনী
৭৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলঃ ৭০০ ০০৯
মুদ্রাকর : রবীন্দ্রনাথ দাশ, মুদ্রাকর প্রেস
১০/১সি, মারহাট্টা ডিচ্ লেন, কলঃ ৭০০ ০০৩
প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

সৈয়দ কওসর জামাল

স্নেহাস্পদেষু

এই লেখকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

উত্তর-জাহ্নবী	নিলয় নাজানি
গোপনে নির্জনে	তৃণভূমি
নৃশংস	এখন অন্ধকার
মায়ামৃদঙ্গ	কামনার সুখদুঃখ
প্রেম-ঘৃণা-দাহ	কেন ভালবাসা ?

সবুজ নক্ষত্র

তোমার বসন্তদিনে

মধুমালা রেলের ওপর ব্যালান্স রেখে হাঁটছিল। একমাথা ফুরফুরে চুল। চনমনে একটা হাওয়া মাঠের দিক থেকে এসে ছোট্ট শান্টিং ইয়ার্ড পেরিয়ে চলে যাচ্ছিল রেলবাবুদের লাল বাড়িগুলোর দিকে—সেখানে বিশাল অশত্থতলায় ক'দিন থেকে এক জ্যোতিষী সাধু এসে বসেছে। ছোটখাট ভিড় হচ্ছে সবসময়। পাশ দিয়েই সরু রাস্তা স্টেশন থেকে এগিয়ে বড় রাস্তায় পড়েছে। তার ওধারে কপালীতলা। সাতশোটা বাড়ি আছে ছোট-বড়। মানানসই বাজার আছে। ডাকঘর স্বাস্থ্যকেন্দ্র পুলিশফাঁড়ি আর ইস্কুল আছে।

বড়রাস্তা ধরে মধুমালা আসেনি। একটু আনমনা, ছটফটে স্বভাবের মেয়ে। আজ সকালে তাকেই স্টেশনে আসতে হবে, আগে জানা ছিল না। দাদা সুকুমারের আচমকা রাত থেকে জ্বর, গলাব্যথা, কাসি। তাই অনেক বলে-কয়ে বোনকে পাঠাল।

কেন, কোন চাকর-বাকর আসতে পারত! মধুমালাকে কেন? না—যে আসবে, সে দাদার অন্তরঙ্গ মানুষ। এমন অন্তরঙ্গ কহতব্য নয়। কলকাতায় থাকতে একপাতে কাড়াকাড়ি করে খেত। এক গেলাসে তেষ্টা মেটাত। চাকর-বাকর পাঠালে ভাববে, বড়লোকী দেখিয়েছে সুকুমার।

মধুমালা বলেছে,—হুঁ, সব বুঝি বাবা। আমার চুপচাপ বসে থাকা তো কেউ দেখতে পারে না। আজ মন খারাপ ছিল তো তাই

চুপচাপ বসেছিলুম। ব্যস্, ওর চোখ গেল অমনি। নাও, এখন ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো।

কেন? মন কেন খারাপ ছিল মধুমালার? এমনি-এমনি। কেন তা কি সে জানে? কোন-কোনদিন সকালে উঠে মা অকারণ তেতো হয়ে ওঠেন না? বাবা বাড়িসুদ্ধ দোষ খুঁজে বেড়ান না? এ হল মনমেজাজের ব্যাপার। কখন কেমন থাকবে, কে বলতে পারে? বিশেষ করে, রাতের বেলা মানুষ শুলেই যেন নিজের ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। তারপর সারারাত কত কী সব হয়, কতকিছু ঘটতে থাকে —স্বপ্ন মেশানো ঘুম, নানারকম ভয় ও ভালবাসার ঘটনা। আজ ঘুম ভাঙার পরও মধুমালা যে এক মিনিট কেঁদেছে, তা সে প্রাণ গেলেও কাকেও বলতে পারে না। শেষদিকের স্বপ্নটা ছিল অদ্ভুত। মধুমালা যেন কনে-বউ, মাথায় মুকুট, মুখে চন্দনের ফোঁটার আল্পনা, বিরাট মাঠের মধ্যে মোটরগাড়ি চেপে যাচ্ছে। কী ধুলো, কী ধুলো! বাবা তাকে ডাকছেন। সে ডাকছে বাবাকে। কেউ কাকেও খুঁজে পাচ্ছে না। এদিকে মধুমালাকে নিয়ে ভুতুড়ে গাড়িটা চলেছে তো চলেইছে। সে কী কান্না তখন!

ঘুম থেকে জেগেও কান্না থামতে চায় না। তারপর দেখে মুখের উপর একফালি টাটকা রোদ পড়েছে। জানলার রডে বসে চড়ুই তাকে খুঁটিয়ে দেখছে। ওদিকে জেঠিমার খোকাটা কোথাও খিট খিট করে হাসছে আর হাসছে। হয়তো বাগানে বাবা তাকে হাঁটা শেখাচ্ছেন। তখন হাসি পেল মধুমালার। হেসেটেসে বিছানা ছাড়ল। কিন্তু দাঁত ব্রাশ করতে গিয়েই হঠাৎ মনটা কেমন করে উঠল। তারপর জলের টবের সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। ব্যস, মন খারাপ শুরু হয়ে গেল। হাত আর চলতে চায় না। মা ডেকে বললেন—কতক্ষণ লাগবে রে? চা জুড়িয়ে জল। সুকু ডাকছে, শোন গে।.....

রাস্তায় বেরিয়ে সে স্বপ্নটার জন্যে দারুণ লজ্জা পেয়েছে। দুঃখ বা মন খারাপ আরও বেড়েছে। কেন অমন বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখল সে —ভুলেও যা কোনদিন মনে আসে না। এই তো সবে ইস্কুল ফাইনাল পাসের খবর এল। ছ'মাইল দূরের জংশনে ঘুঘুডাঙায় মেয়েদের কলেজ আছে। মা ও দাদা ওকে ভর্তি করাবার জন্যে ব্যস্ত। ট্রেনে ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করবে আরও সব মেয়ের মত। আজকাল কত সুবিধে হয়েছে দেশে। ওদিকে বাবা সেকেলে মানুষ। উনিশশো তিরিশে ম্যাট্রিক পাশ করে মোক্তারী পড়েছিলেন। সম্প্রতি পেশা ছেড়ে জমি-জমা দেখছেন। তাঁর প্রবল ইচ্ছে, মেয়ের বিয়ে দেওয়া যাক। স্ত্রীলোকের অত বিদ্যে বুদ্ধি না থাকলেও চলবে। পৃথিবীটা মুখ্যত পুরুষই চালাচ্ছে। আরে বাবা, চল তো দেখি স্টেশনে—ট্রেন একবার স্টার্ট দিলে কোন মেয়ের বুকের পাটা আছে যে লাফ দিয়ে পাদানীতে উঠবে? ওসব ব্যাপার পুরুষের পোষায়। বিশ্বসংসার একটা ট্রেনের মত।.....

খানিকটা গোলমাল করে দিয়েছেন কপালীতলার কয়েকজন ভদ্রলোক। মধুমালার সহপাঠিনীরা তাঁদেরই মেয়ে। তিনজনের বিয়ে পরীক্ষার অনেক আগে হয়ে গেছে, দুজনের হব-হব অবস্থা। বাকি শুধু একজন—শ্রীলতা। জগন্নাথ ডাক্তারের মেয়ে। বায়োলজি নিয়ে পড়বে এবং তারপর মেডিকেলে ঢুকবে। মধুমালার বাবার মতে, শ্রীলতা মেয়েই নয়—আস্ত ছেলে। ভলিবল ব্যাডমিণ্টন সাঁতার এইসব খেলায় ভারি পাকা। খেলার সময় চেহারার হাবভাব লক্ষ্য করেছ কি কেউ? মেয়ে বলে ভাবা যায় না।

প্রমথ বড় অদ্ভুত মানুষ। বলার ভঙ্গীতে ঠাট্টা-তামাশা থাকলে কী হবে - যা বলেন, তা ওঁর নিজের কাছেই বেদবাক্য।

তবে ইদানীং বয়েস হয়েছে। ছেলে সুকুকে সমীহ করে চলছেন। এটাই মধুমালার যা ভরসা।

শেষরাতের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়। যেই কথাটা মনে পড়া, মধুমালা ছটফট করে উঠেছিল। তারপর রাগের ঘোরে সোজা রাস্তায় স্টেশনে না গিয়ে ঝোপজঙ্গল পেরিয়ে শান্টিং ইয়ার্ডে ঢুকেছে। যেন এভাবেই একটা শোধ নেওয়া হল ব্যাপারটার। মধুমালা ঘুরপথেই চলবে। তারই প্রতীক যেন।

কিন্তু হঠাৎ অশথতলায় জ্যোতিষীর কথা ভেবে একটা লোভ জাগল। এত সকালে ভিড়টা থাকে না। একবার গিয়ে হাত দেখাবে নাকি?

সঙ্গে পয়সা নেই। তাই ইচ্ছেটা চেপে দিতে হল। আগের মত রেলে ব্যালান্স রেখে হাঁটতে থাকল। জ্যৈষ্ঠমাসের শেষ সপ্তায় সেই কবে বৃষ্টি হয়েছে, মনেই পড়ে না। যে সব ঘাস বা গাছপালা প্রথম বৃষ্টিতে জোরাল ধরণের সবুজ রঙ পেয়েছিল, ক্রমশ পাংশুটে মেরে যাচ্ছে। দুপুরের দিকে হাওয়াটা পুব থেকে আসতে আসতে খুবই তেতে যায়। সকালেই যা খানিক আরাম। সেই আরাম নিয়ে মধুমালার চুলগুলো উড়ছিল। ইয়ার্ডটা উঁচু—একধারে গভীর নয়ান-জুলি, ওপরে ঝোপঝাড়।

সেখান থেকে আওয়াজ আসে—বাঃ! অপূর্ব! অপূর্ব! এ যে ট্রাপিজের খেল নাতনী!

মধুমালা চমকে ওঠে এবং লজ্জা পেয়ে রেল থেকে নামে। কোবরেজমশাই ঝোপে দাঁড়িয়ে আছেন। মাথাটা সাদা, দাড়িগোঁফও তাই, গা ও পা খালি—পরনে হাঁটু অব্দি পট্টবস্ত্র, হাতে কাটারি। গুলঞ্চলতা নিতে এসেছেন। মধুমালা একটু হাসে।

—থামলে কেন? রসভঙ্গ হল যে! তাল কাটল। কোবরেজ-মশাই ঝোপ থেকে বেরোন।—জান তো, তাল কাটলে কী হয়? দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় একবার নাচের তাল কেটেছিল উর্বশীর। তার

ফলে মর্তে জন্ম নিতে হল। মর্তে বড় কষ্ট, নাতনী। ভীষণ কষ্ট।.....

এই পাগলা বুড়োর পাল্লায় পড়লে আর রক্ষে নেই। একঘণ্টা সমানে বক বক করে যাবেন। অতএব মধুমালা ঝটপট বলে ওঠে—স্টেশনে যাচ্ছি। দাদু, সাড়ে সাতটার আপ চলে যায়নি তো? কতক্ষণ আছেন আপনি?

কোবরেজমশাই সকৌতুকে নিজের কব্জি দেখিয়ে বলেন—কেন? তোমার কাছে কালযন্ত্র নেই?

—নাঃ। পরিনি মধুমালা একটু হেসে জবাব দেয়।

—যে যুগ পড়েছে, সব সময় পরে থাকবে। তোমরা একালের মানুষ, নাতনী! আমার কথা অবশ্য আলাদা। আছি, না আছি—অন্ধবৎ। কিবা দিন, কিবা রাত।

মধুমালা পা বাড়িয়ে বলে—দাদুর কানদুটো নিশ্চয় আছে?

হো হো করে হেসে কোবরেজমশাই কাটারি ও লতাশুদ্ধ দু' কান ছুঁয়ে বলেন—আছে মনে হচ্ছে।

—ট্রেনের শব্দ শোনেন নি?

হঠাৎ লাফিয়ে ওঠেন কোবরেজমশাই।—রাধেমাধব! রাধেমাধব! মনে পড়ছে, একটু আগে একটা গাড়ি পাস করল যেন। তখন একটা ঢ্যামনা সাপকে ঝোপ থেকে তাড়াতে ব্যস্ত ছিলাম বলে মুখ তুলে তাকাই নি। নাতনী! দেখ তো, উত্তরে আকাশে কালো ধোঁয়াটোয়া দেখতে পাচ্ছ নাকি? শালা মেঘের তো দেখাই নেই—কালো কিছু দেখলেই জানবে সাড়ে সাতটার ডাউন!

শুনেই তাকিয়েছিল মধুমালা। ও, এতক্ষণ তার কানে আসা উচিত ছিল। আপের দিকে ডিসট্যাণ্ট সিগন্যালের পর বাঁকের গাছ-পালার আকাশে টাটকা ধোঁয়া আবহমণ্ডলে মিশে যাচ্ছে, ছত্রখান হয়ে পড়ছে জোরালো বাতাসে। চাপা ধক ধক একটা আওয়াজ

আস্তে আস্তে ক্ষীণতর হচ্ছে। স্টেশনের দিকে তাকায়। উঁচু ভিটের উপর স্টেশনের ঘর। নীচু প্ল্যাটফর্মে সম্ভবত কিছু সাঁওতাল পরিবার ঘরকন্নার আসবাব সামলাতে ব্যস্ত। তাদের কাছে একজন নীল জামাপরা খালাসী দাঁড়িয়ে বচসা করছে। স্টেশনের বারান্দা থেকে ওপাশের গেটের দিকে কিছু লোক সরে চলে গেল। বাদ বাকি সব খাঁ খাঁ। শুধু একটা বিষণ্ণ কুকুর চুপচাপ দাঁড়িয়ে কিছু শুঁকছে। পিপুল আর কৃষ্ণচূড়ার তলায় ঘন ছায়া।

তার মানে আপ ট্রেনটা এসে চলে গেল। মধুমালা বড়বাস্তা থেকে ঝোপজঙ্গলে ঢোকার আগেই স্টেশন থেকে ছেড়ে গেছে। সে একটুও শোনে নি। কারণ, তার মন অন্য কিছু শুনছিল। শেষ রাতের বিয়ের বাজনার প্রতিধ্বনি—কিংবা ···

মধুমালা কোন কথা না বলে হনহন করে লাইন ডিঙিয়ে চলে যায়। প্ল্যাটফর্ম এখনও নীচু। যাত্রীদের মই বেয়ে ওঠার মত গাড়িতে উঠতে হয়। এ নিয়ে খুব লেখালেখি চলেছিল। এবার নাকি শিগগির উঁচু করা হবে। বিজলীব লাইন এসে গেছে স্টেশনে। ওভারব্রীজ হবে। দিনে দিনে স্টেশনের গুরুত্ব বাড়ছে কিনা।

পিপুলগাছটার গোড়া বাঁধানো। লাল সিমেন্টেব গোল চত্বর কয়েক জায়গায় ফাটা। তাতে খড়ি দিয়ে নানান জায়গায় নাম লেখা আছে। কপালতলীর ছেলেরা—যারা খেলাধূলো ভালবাসে না, বিকেলে এখানে এসে বসে থাকে। যাত্রী দেখে। টিপ্পনী কাটে। তারাই লেখে নিশ্চয়। আধমোছা নাম সব। কোনটা যুক্তচিহ্ন দেওয়া —পাশে কোন মেয়ের নাম। 'তপন+অঞ্জলি'! অঞ্জলি তো বড় স্টেশনবাবুর মেয়ের নাম। বাবা রে বাবা, কী সাহস ওদের!

মনখারাপ ভাবটা চলে যায় মধুমালার। ফিক করে হেসে ওঠে। তপনটা কে? অঞ্জলি নিশ্চয় জানে না এ ব্যাপারটা। জানলে যা কাণ্ড হবে, ভাবা যায় না। তপন কে, রাখীর কাছে জেনে নেওয়া

যাবে। ওর সঙ্গে সব ছেলের খাতির আছে। সুধীর+ধরণী। কী কাণ্ড! মধুমালা আপনমনে হাসে। দুজনেই তো ছেলে।

কপালতলী স্কুলে কো-এডুকেশনের ব্যবস্থা আছে। ছেলেরা আজকাল যা পাজী হয়েছে, কহতব্য নয়। এমন কীর্তির সংখ্যা সেখানে আনাচে-কানাচে প্রচুর। মাস্টারমশাই আর দিদিমণিদেরও রেহাই থাকে না। কতবার সে নিয়ে হৈ-চৈ হয়েছে। কিন্তু মধুমালার নামে তেমন কোন মন্তব্য লেখা হত না। একবার তার কৈফিয়ৎ লেখা হয়েছিল—সাবধান, প্রমথ মোক্তার আদালতে নিয়ে যাবে, হাতে হাত-কড়া। এমনি সব কত ইঙ্গিত!

মধুমালা ঠোঁটে আঙুল কামড়ে এবং হাসি নিয়ে চত্বরটা দেখতে থাকে। হঠাৎ সে 'মধু' দেখেই চমকে ওঠে—গোল চত্বরের খাড়াইয়ে লেখাটা শুরু হয়েছে। পড়তে গেলে ডাইনে এগোতে হবে। সে দ্রুত সরে যায় সেদিকে। তারপর থমকে দাঁড়ায়।

'আমার স্বপ্নে দেখা মধুমালা থাকে, বড়রাস্তার বাঁকে। মোটরগাড়ি চাপিয়ে নিয়ে তাকে, চলে যাব.....

মেলাতে পারে নি, কিংবা কেন, এখানেই ছেড়ে দিয়েছে। তার পরের লাইন: 'মধুমালা, তোমাকে স্বপ্নে দেখেছি। ইতি র।'

এসব দেখলে মনে কী যে হয়, রাগ না দুঃখ, ঘৃণা না শিউরে ওঠা স্পষ্ট বোঝা যায় না। ঠোঁট নিঃসাড় লাগে। বুকের ভিতর হাওয়া বয়ে যায় হু হু করে। আর কোথাও একটু আলোয় রাঙা জগতের ঝলমলানি, মেঘের ফাঁকে রোদের মত। সে কি সুখ, সে কি দুঃখ—এই বয়সে কেউ বোঝে না। বুঝতে পারে না। কানের লতি যায় রেঙে। গালে টোল পড়ে। চোখের দৃষ্টিতে কী সব কুয়াশা এসে জড়িয়ে যায়। সেইসব কুয়াশার ভেতর প্রজাপতিরা আসে ঝাঁকে ঝাঁকে। হঠাৎ চমকে যায় এক দারুণ গোপন বোধে—আমাকে নিয়ে কাদের ভাবনা!

আর লজ্জা, লজ্জা এবং লজ্জা। সেই ধরাপড়ার লজ্জা।

এদিক-ওদিক দ্রুত তাকিয়ে সে ঝটপট কথাগুলো মুছে ফেলতে থাকে। হাতের তালু সাদা হয়ে যায়।

তারপর গলার শিরা ফুলে ওঠে মধুমালার। ঠোঁট কামড়ে ধরে। খুব রেগে যায়। চত্বরটার সামনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে চত্বরটাকেই ভীষণ অপমান করার উপায় খোঁজে।

কিন্তু কিছু খুঁজে পায় না। 'র' কে? কয়েকটা ছেলের নাম মনে পড়ে যায়। রবীন, রথীন, রঞ্জন, মুসলমানপাড়ার রফিক····কিন্তু না, রফিকের সে-সাহস হবে না। রবীনই কি? বড় ফাজিল ধরনের ছেলে। মেয়েদের পিছনে লাগা অভ্যেস আছে। রবীনকে জব্দ করার উপায় খোঁজে সে—নিরাপদ উপায়। বাড়িতে কেউ যেন টের না পায়। সেটা বড্ড লজ্জার ব্যাপার হবে। মধুমালার সম্পর্কে আজ অব্দি কোনরকম কথা ওঠে নি। মা মন্দিরা গর্ব করে বলে বেড়ান—আসলে নিজেদের মেয়ে শাসন করতে পারে না, পরের ছেলের দোষ দেয়। কই, আমার মালুও তো আছে। কোন ছোঁড়ার সাধ্য চোখ তুলে তাকাক্ না দেখি!

এই সময় তার চোখ গেল প্ল্যাটফর্মের শেষ দিকে সাঁওতাল লোকগুলোর ওপর। নীল উর্দিপরা খালাসিটা দাঁড়িয়ে আছে তখনও। বড় বড় দাঁতগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কেন হাসছে ও?

এতক্ষণে দেখতে পায় মধুমালা। লোকগুলো সাঁওতাল নয়—বেদে। জ্যৈষ্ঠ-সংক্রান্তিতে কপালী নদীর ওপারে মনসাপূজার ধূম হয়। সেই উপলক্ষে প্রতিবছর বীরভূমের পাহাড়ী এলাকা থেকে ওরা আসে। সাপ গায়ে জড়িয়ে নাচে। পয়সা পায়।

মুহূর্তে চঞ্চল হয়ে ওঠে মধুমালা। যে-ছেলেমানুষী সে আজকাল ছাড়ব-ছাড়ব করে এগোচ্ছে, ছাড়া যাচ্ছে না—সেটা প্রচণ্ডভাবে পেয়ে বসে তাকে। এক নেশার টানে সে এগিয়ে যায় লোকগুলোর দিকে।

ওরা একটা ঝাঁপি খুলে ফণাতোলা সাপের নাচ দেখাচ্ছে খালাসীটাকে। সম্ভবত এই দিয়েই ভাড়াটা অর্থাৎ রেলের টিকিট উসুল করছে। আর কীই বা করবে—এত গরীব সব।

মধুমালা ফণাতোলা ধূসর প্রকাণ্ড গোখরোটাকে দেখামাত্র শিউরে ওঠে। কাঠের মত হয়ে যায় সারা শরীর। সব ভুলে সে সাপটা দেখতে থাকে। খালাসী বলে—দেখছেন দিদি, ওই যে মাথায় নীল-লাল চক্কর, ওটাই হল গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণ। দেখুন, লক্ষ্য করে দেখুন।....

স্টেশনঘরের বারান্দার ধারে যে দিকটায় সাদা রঙের বেড়া, বুনো লতাপাতা উঁকি মারছে। যেন ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে আছে সভ্যতার দিকে। এই লাল ইটের দেয়াল, টিকিট কাউন্টার ও টিকিটবাবুদের মধ্যে সভ্যতার ব্যাপার স্যাপার দেখে তাজ্জব হচ্ছে তারা। আর এই দুটি আগন্তুক, বয়সে নবীন, তাদেরও দেখছে যেন। যেমন করে এসব পাড়াগাঁয়ের বউঝিরা নতুন লোক দেখে, চাউনিগুলো তেমনি।

কয়েক মিনিটেই স্টেশনঘরের বারান্দা ফাঁকা। গেট দিয়ে গল গল করে বেরিয়ে গেছে যাত্রীস্রোত। ছোট্ট চায়ের স্টলের মালিক খবরের কাগজ পড়ছে, মুখটা নীচু। এইমাত্র এল কলকাতা থেকে। বয় ছোঁড়াটা কেটে পড়েছে অশত্থতলার সাধুর কাছে। আবার গাড়ি ন'টা পাঁচের ডাউন।

দিব্য ভুরু কুঁচকে বেড়ার জংলী ব্যাপারগুলো দেখছিল। বয়স ছাব্বিশ সাতাশের মধ্যে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল কাঁধছোঁয়া, গোঁফ আছে। লম্বা নাকের নীচে সেই গোঁফের তীব্রতা আছে। পাতলা ঠোঁটদুটো। চোখ দুটো অন্যরকম—চেহারার তীক্ষ্ণতা চোখের

বিশালতায় ভেসে গেছে। লম্বা সে। টকটকে ফর্সা রং, পরনে গাঢ় নীল সেমিবেলবটস, পুরোহাতা ফিকে গোলাপী শার্ট—পায়ে গাব্দা স্লিপাব। কাঁধে গাঢ় লাল নক্সা কাটা ঝোলা। তাকে হঠাৎ অ্যাংলোইণ্ডিয়ান বলে ভুল হতে পারে।

—ইস্! অস্ফুট শব্দ করে ওঠে সে।

শান্তনীল বিবক্ত মুখে চায়ের স্টলের দিকে তাকিয়েছিল। মুখ ফিরিয়ে বলে—উঁ?

—সাপ।

—সাপ তো থাকবেই। যা জঙ্গল! বলে শান্তনীল তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

শান্তেব মাথাব চুল দিব্যেব চেযে অবিন্যস্ত, টেবি আছে। গোঁফ ও দাড়ি আছে চিবুকে। ভরাট মুখ। নাকেব হাড মোটা, ডগা সূক্ষ্ম। চোখের দৃষ্টিতে চাপা রাগের ভাবটা স্থায়ী। অথচ কথা বলার সময হাসিটা বাঁধা। তাব গায়ে বাদামী মোটা কাপড়ের বুশশার্ট. দুকাঁধে কলার—দুই বাহুতেও পকেট, বুকে দুটো পকেট—সব পকেটের ওপর আধখানা চাঁদের মতো ঢাকনা, একটা লাল সরু কলমের মাথা দেখা যাচ্ছে। একটু তামাটে রঙ তাব চামডার। চোখের তলায কালো ছাপ আছে। কপালে একটা কাটার দাগ আছে। দিব্যের চেয়ে মাথায় খাটো বলে বেঁটে দেখায় তাকে। চৌকো চোয়াল। দাঁত চেপে কথা বলে, তাই চওড়া সাইডবার্নের তলা থেকে চিবুকের দাডির প্রান্ত অব্দি চোয়ালের হাড নড়ে ওঠে। মনে হয়, চিবুচ্ছে সবসময়। তাব পরনে ইয়াঙ্কি টেডিবয়দের সাতটা পকেটওলা খসখসে ছাইরঙা প্যাণ্ট নীচের দিকটা চোঙা। পায়ে পা-ঢাকা সোয়েডের জুতো - যাকে বলে বুশ-শু। তার কাঁধে একটা পলিথিনের কিটব্যাগ। একটা ক্যামেরাও ঝুলছে। ঝুলছে একটা ভিউ-ফাইণ্ডার। শৌখিন রকমের পর্যটকের চেহারা।

দিব্যর দৃষ্টি বেড়ার পাশে একটা তরুণ তালগাছের গুঁড়িতে—গুঁড়িটা আগোছাল ও সীসেরঙের ঘন চাপ চাপ বাগড়ায় ঢাকা। সে ভাল করে দেখে নিয়ে বলে—না, সাপ নয়। সাপের খোলস!

—রিয়েল সাপের খোলস তো? একটু তামাশা করে শান্তনীল।

তারপর দিব্য ঘোরে।—স্টলের ভদ্রলোককে জিগ্যেস করা যাক।

শান্ত আবার বিরক্ত হয়।—কিন্তু ব্যাপারটা কী? সুকু আসেনি!

—তাতে কী হয়েছে? তুই বড্ড ফর্মালিটির ভক্ত!

শান্ত পা বাড়িয়ে বলে · স্টেশনের কাছের লোকেরা হরদম ট্রেন ফেল করে, শুনেছি। যাক্‌গে, আয়—চা খাই।

—হুঁ। দিব্য এগিয়ে যায়।—এই যে দাদা. হবে নাকি?

স্টলের লোকটি কাগজের পাতায় চোখ রেখেই মাথা নাড়ে এবং ডাকে—নিতাই, বাবুদের চা দে।

পাশে কয়লার গোল চুলোয় গোল টিনের বড় পাত্রের ঢাকনা কাঁপছে। ভাপ বেরুচ্ছে। বেঞ্চে দুজনে আরাম করে বসে। শান্ত বলে—আপনার নিতাই মনে হচ্ছে নেই।

লোকটা একই ভঙ্গীতে একটু জোরে ডাকে—নিতাই! এ্যাই নিতাই!

দিব্য বলে—শান্ত, তুই জানিস সুকুদের বন্দুক-ফন্দুক আছে নাকি?

ঘাড় নাড়ে শান্ত। জানে না।

—পাখি ফাকি মারা যেত! কত পাখি!

—সব পাখি খায় না।

—হুঁ। কই দাদা. আপনার নিতাই কোথায়?

লোকটা আচমকা কাগজ নামিয়ে চটপট ভাঁজ করে ফেলে টুল থেকে পা নামিয়ে স্যাণ্ডেল পরতে থাকে। রাগী মূর্তি। হেঁড়েগলায়

চেঁচিয়ে ওঠে—এ্যাই নিতাই! হতভাগা, দেখাচ্ছি মজা শালাকে। গুষ্টির ষষ্ঠীপুজো দিচ্ছে ব্যাটা।

শান্ত একটু অস্বস্তিতে কাঠ হয়ে তাকিয়ে থাকে। নিশ্চয় একটা বাজেরকমের মারধোর দেখতে হবে! বাচ্চাদের মার খেতে দেখলে তার খারাপ লাগে। দিব্য একটা সিগারেট ধরায়। মুখটা ভাব-লেশহীন। কিন্তু লোকটা তেমন কিছুই করে না। আগন্তুকদের আড়চোখে দেখতে দেখতে কাপ-প্লেটে গরম জল ঢালে।

শান্ত বলে—দাদা, সুকুমার রায় বলে এখানকার কাকেও চেনেন নাকি?

—খুব চিনি। মোক্তার বাবুর ছেলে। আপনারা কলকাতা থেকে আসছেন?

—হ্যাঁ। ওদের বাড়িটা কোথায়?

—ওই যে গাছগুলো দেখছেন, ওখানে বড়রাস্তা। দক্ষিণে চলে যাবেন সোজা বাজার ছাড়িয়ে, তারপর জিগ্যেস করবেন। রাস্তার বাঁকে বাড়ি—শেষদিকে।

—বিকেলের দিকে কলকাতা ফেরার ট্রেন ক'টায় বলতে পারেন?

—খুব পারি। এ্যাই নিতাই! আয়, মজা দেখাচ্ছি।...বলে চায়ে দুধ মেশায় সে। তারপর বলে—ট্রেন সেই তিনটে পঁচিশ সিডুল টাইম, আসে প্রায় পৌনে চারটেয়। আজকালকার ব্যাপার! তারপরের ডাউন ছ'টা সতেরো। সিডুল। তারপর একেবারে রাত ন'টা পঁয়তাল্লিশ। আজই ফিরে যাবেন?

শান্ত হাত বাড়িয়ে কাপ নিয়ে বলে—হয়তো। কী রে দিব্য, আজই ফিরবি তো?

লোকটা বলে—আপনার চা, স্যার।

শান্ত চোখ নাচায় দিব্যের দিকে। ওকে স্যার বলছে তাই। দিব্যের মধ্যে একটা কী আছে—তাকে লোকে বেশ খাতির-টাতির

করে। দিব্য চা নিয়ে বলে—জায়গাটা ভাল লেগেছে। রাতে থাকতে আপত্তি নেই। অবশ্য....

—সুকু যদি বলে! আমরা তো গেস্ট!....শান্ত খুক খুক করে হাসে। হাসির সময় ওর একহাতের আঙুল বরাবর মুঠো পাকিয়ে যায়। উরুতে ঠোকে।

দিব্য বলে—আমি অবশ্য বলার ধার ধারিনে। নিজেই তো চলে এলুম। জানিস, ও অবাক হবে আমাকে দেখে। ভাববে, হঠাৎ এ ব্যাটা কোত্থেকে?....একটু চুপ করে থেকে সে ফের বলে—সুকু আমায় কোনদিন আসতে বলেনি।

—বলেনি। মানে, হয়তো পাড়াগাঁ, এবং ওদের ফ্যামিলি লাইফ অন্যরকম। সংকোচ থাকা স্বাভাবিক। দেখ দিব্য....বলে শান্ত আবার খুক খুক করে হাসে ও মুঠো ঠোকে উরুতে। ...আমার মনে হচ্ছে, সত্যিসত্যি এসে পড়ব, ও ভাবেনি। তাই স্টেশনে আসেনি। কিংবা....

দিব্য তাকায়।

—কিংবা...গলার স্বর চাপা করে শান্ত বলে যায়।....ওদেব ফ্যামিলি সম্পর্কে এ্যাদ্দিন এন্তার গুল ঝেড়েছে। বলেছে, জমিদারী ছিল ঠাকুর্দার আমলে ইত্যাদি ইত্যাদি। বলেছে না? হাতি ছিল, ঘোড়া ছিল, একটা ফোর্ড গাড়ি ছিল ফর্টিটুতে বেচে দেয়। কোথায় ওদের সুন্দর বাগান আছে—যেখানে পীচ গাছ আছে। রিয়েল চাইনিজ ফ্রুট! ভাবা যায়?....আবার হাসতে থাকে শান্ত। হাসির চাপে চায়ের কাপ উল্টে যাবার দাখিল।

দিব্য ওকে চিমটি কাটে। চাওলা শুনছে—কানে তুলতে পারে! তারপর দিব্য ঠোঁট চোঙা করে শিস দিতে থাকে।

শান্ত বলে যায়—এই! যদি সব গুলতাপ্পি হয়, ও কিন্তু লজ্জায় পড়ে যাবে। চল্, নেক্সট ট্রেনে মানে মানে কেটে পড়ি। দাদা, নেক্সট ডাউন ক'টায়?

—ন'টা পাঁচ। আসে সাড়ে ন'টায়। আর বলবেন না। ...বলে আচমকা লোকটা 'এ্যাই নিতাই' হাঁক ছেড়ে স্টল থেকে বেরিয়ে যায়।

গেট পেরিয়ে গেলে শান্ত উদ্বিগ্ন করে তোলে মুখটা—এই রে! মার্ডার ফার্ডার হবে। বুঝলি দিব্য? কী ব্যাপার দেখ, একটা আইন আছে—মাইনরদের দিয়ে কাজ করানো চলবে না। অথচ রেস্তোরাঁ থেকে শুরু করে সব জায়গায় বাচ্চা দিয়ে লোকে কাজ নেয়। ইভ্‌ন্ বাড়িতেও। আমাদের পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোক···

দিব্য হঠাৎ প্ল্যাটফর্মের দিকে দূরে দৃষ্টি রেখে অস্ফুট বলে ওঠে —ইস্!

—কী রে? আবার সাপ?

দিব্য চুপ। কিন্তু দৃষ্টিতে স্বতস্ফূর্ত বিস্ময় অথবা মুগ্ধতা আছে।

—এই! স্নেকবাইটিং খেয়ে নির্ঘাৎ যাব রে দিব্য! এত সাপ! ভয় করছে।

—সাপ না। মেয়েটা!

শান্ত সোজা হয়ে বসে—মেয়েটা? ও! বাঃ! লাভলি মাইরি! চার্মিং! এখানে এমন জিনিস আছে? ওঃ দিব্য! আমি দুদিন থাকব এখানে। টু ডেজ! হস, ভাবা যায় না! কী জিনিস রে!

দিব্য চায়ে চুমুক দেয়। কিছু বলে না। কিন্তু চোখ সেদিকেই।

শান্ত প্রায় ছটফট করে।—ওকে আসতে বল্‌না শালা! লেট হার কাম, নাকি আমরা যাব? দিব্য, চল্ মাইরি। তোর পায়ে পড়ি! এ্যাদ্দুর আসাটা নিস্ফলা হল না, বল্! এই দিব্য, তুই ভ্যাবলা হয়ে গেছিস কেন রে? বল্ একটা কিছু? বেবি! উইল ইউ কাম হিয়ার?—

চায়ের কাপটা কাউন্টারে রেখে সে দিব্যকে খোঁচা দিতে থাকে। দিব্য নির্বিকার মুখে কাপটা রেখে পকেট থেকে রুমাল বের করে পা

ছড়িয়ে মুখটা মোছে। সিগ্রেট ধরায় আবার। তারপর ভুরু কুঁচকে শাসনেব ভঙ্গীতে বলে—মেরে ঠ্যাঙ খোঁড়া করে দেবে। এ কি চৌরঙ্গী পেয়েছ?

শান্তর উত্তেজিত ভঙ্গীটা সমান ছিল। এবার সে হঠাৎ নড়াচড়া বন্ধ করে। ফিসফিস করে বলে—শী ইজ কামিং ' দিব্য! আসছে এদিকে। ওঃ শালা! আই মাস্ট ডাই! জাস্ট এ ড্রিম।

দিব্য তাকিয়ে থাকে নিষ্পলক।....

মধুমালা হন হন করে এসে স্টেশনের উঁচু ও খোলামেলা বারান্দার নীচে একটুখানি দাঁড়ায়। সিঁড়ি বেয়ে উঠে পড়ে ওপরে। তারপর চৌকোনা চ্যাপ্টা থামের পাশ দিয়ে ঢাকা বারান্দায় যায়। তাঁর বাঁদিকে চায়ের স্টল, ডাইনে ও সামনে স্টেশন ঘরের দরজা। সামনের দরজায় উঁকি মেরে দেখে বড়বাবু ইয়া বড় রেজিস্টারে কী সব টুকছেন। ছোটবাবু টিকিটের আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে টিকিট মেলাচ্ছেন। সিগন্যালম্যান মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে আছে। সব যেন মূর্তি।

সে দরজার পাশের ওজনযন্ত্রে উঠে দাঁড়ায়। আধুনিক যন্ত্র নয়—সেকালের হাতওয়ালা একটা অদ্ভুত ব্যবস্থা। এক বর্গগজ লোহার পাতে মাল ওজন হয়। হাতলটা ধরে সে নিজেব ওজন বোঝবার চেষ্টা করে।

এই সময় স্টলে একটা বকাবকি শুরু হয়েছে। চাওলা তারকবাবু বয়টার কান ধরে টেনে এনেছে! আরও কারা কথা বলছে।

তারপর সব চুপ। মধুমালা ওজনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ওপরে মস্ত বড় টাইমটেবলটা পড়তে থাকে। অল-ইনডিয়া চার্ট। একটায় ভাড়ার অঙ্ক। অন্যটায় সময়। সব স্টেশনেই এমন চার্ট থাকে। ছোট হরফে ছাপা। তাহলেও মধুমালা পড়তে পারছে। শুরু হয়েছে

হাওড়া থেকে। শেষ দেরাদুনে। দেরাদুন! কতদূরে দেরাদুন? জায়গাটা কেমন?

—আরে! মালাদি যে? কী খবর বোনটি? ভাল তো? হঠাৎ যে!

তারকের কথা শুনে মধুমালা গম্ভীর হয়ে মাথাটা দোলায় শুধু। তারপর ঘুরে রেললাইনের দিকে তাকাতে তাকাতে ঢাকা বারান্দার কোনার থামটা পেরিয়ে যায়। ওখানেই স্টলের সামনেটা। প্যাসেজমত। বারান্দার ওদিকটা দিয়ে হাঁটলে গেটে যাওয়া যায়। মধুমালা খোলামেলায় দাঁড়িয়ে গেল। তার দৃষ্টি এখনও রেললাইনের দিকে। চোখের কোনায় কখন থেকে দেখে নিয়েছে দুই মূর্তি বসে আছে স্টলের বেঞ্চে। একজনের জায়গায় দুজন—তখন নিশ্চয় দাদার লোক নয়।

অবশ্য দাদার লোকটা সঙ্গে আরেকজন আনবে না তার মানে আছে কি? দাদার বয়সী এবং চেহারায় কলকাতার ছাপটা ধরা যায় সহজেই। গাঁয়ের মানুষের এটা সহজাত। কিন্তু ওরা যদি তাই হয়, একটু দেরী করে ফেলছে মধুমালা—সংকোচ হচ্ছে। ওরা ডেকে জিগ্যেস করুক না। কলকাতার ছেলেরা তো স্মার্ট হয় খুব।

—সুকুটা মাইরি কী? শান্তনীল উঠে দাঁড়ায় এবং চায়ের দাম মেটাতে থাকে।

অমনি তারক বলে ওঠে—ওই মলো যা! মালাদি! শুনছ গো? এনারা বোধহয় তোমাদের বাড়িই এসেছেন।

দিব্য দাঁড়িয়ে বলে—বোধহয় নয়। এসেছি! কে ও?

—আপনারা যান স্যার। ওনার সঙ্গে যান। ওই তো মোক্তারবাবুর মেয়ে। সুকুমারবাবুর বোন! মালাদি, এনাদের নিয়ে যাও!

মধুমালা একবার ঘুরেছিল মাত্র। নির্বিকার মুখ। শান্ত তার

পাশে গিয়ে বলে—আপনি....মানে তুমি বুঝি সুকুমারের বোন? ও বলেনি যে আমি আসব?

মধুমালা একইভাবে থেকে মাথাটা দোলায়। মনে মনে বলে—বলেছে। কিন্তু একজন আসার কথা। দুজন যে!

—বলেছিল? বাঃ! তাহলে তুমি আমাদের রিসিভ করতে এসেছ? তা এত দূরে আনমাইণ্ডফুলি ঘুরে বেড়াচ্ছ যে? শান্ত খুক খুক করে হেসে ওঠে।—আমাদের নিয়ে চল।

মধুমালা হঠাৎ কেন ফোঁস করে ওঠে—কলকাতার ছেলেরা ভদ্রতা করে কথা বলতেও জানেন না? আসুন।

—মাই গুডনেস! শান্ত ভড়কে যায়। কেন? অভদ্রতাটা কী করলুম?

দিব্য গম্ভীর মুখে বলে—ওকে তুমি বলাটা নিশ্চয়ই অভদ্রতা। দেখছি, শী ইজ কোয়াইট এ লেডি।

শান্ত কপট গাম্ভীর্যে বলে—রাইট, দ্যাটস রাইট! প্লীজ ফরগিভ মি, মিস মালা।

ওরা যেন তাকে ঠাট্টা করছে—মধুমালা আবার ফোঁস করে বলে—এটা বাংলাদেশ। আপনারাও বাঙালী। আসুন! আমার এত সময় নেই।

শান্ত এবার হা হা করে জোরালো হেসে বলে—এঃ! বড্ড সিরিয়াস মিস মালা!

—আমি মিস মালা টালা নই। শ্রীমতী মধুমালা রায়। আসুন।

বলে সে হন হন করে এগিয়ে যায় গেটের দিকে। দিব্যের পাঁজরে খোঁচা মেরে শান্ত চলতে থাকে। দিব্য ভাবলেশহীন মুখে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হেঁটে যায়। অশথতলায় গিয়েই মধুমালা হঠাৎ ঘুরে বলে - এই রাস্তা দিয়ে গিয়ে বড়রাস্তা! তারপর জিগ্যেস করলে বলে দেবে। আমি একটু পরে যাচ্ছি।

তারপর সে জ্যোতিষী সাধুর সামনে বসে পড়ে। হাত বাড়িয়ে বলে—একবার দেখুন না সাধুবাবা।

সাধু হেসে ওর হাতটা নেন। শান্ত বলে—দিব্য। এক মিনিট—হাতটা দেখিয়ে নিই।

তখন মধুমালা নিজের হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলে—পরে আসব বরং। কই, আসুন।

শান্ত হাসতে হাসতে বলে—আহা দেখেই নিন না।

মধুমালা চলতে থাকে। দিব্য তার পিছু নিয়ে সস্নেহে বলে—পরীক্ষা দিলেন নাকি? রেজাল্ট বেরোয় নি বুঝি?

মধুমালা এতক্ষণে হাসে। —কই, আসুন।

শান্তের এবার রাগ হয়েছে। পা বাড়িয়ে আপন মনে বলে—সুকুর বোনটার মাথায় ছিট আছে।

॥ দুই ॥

কলকাতা থেকে শান্তনীলের একা আসার কথা। দিব্যও এসেছে। এতে সুকুমার খুব খুশি। জ্বর গায়ে এসে বসেছিল সে। বাবার প্রকাণ্ড ইজিচেয়ারে। এত লম্বা যে পা ছড়িয়ে ঘুমানো যায়। ঘরটাও বেশ বড়। কোণের দিকে একেলে সোফাসেট আছে। অন্যপাশে অনেকগুলো চেয়ারের মধ্যে একটা সেকেলে সেক্রেটারিয়েট টেবিল। পেছনে চারটে আলমারি। চামড়ার বাঁধানো আইনের বই ঠাসা। বাবার শুধু ফৌজদারী মামলার প্র্যাকটিস, মোক্তার হিসেবে ঝানু, পয়সা করেছেন—কিন্তু কেতা ছিল ব্যারিস্টারের। আপিস করেছিলেন দুজায়গাতেই। ছুটির দিনে আর সন্ধ্যার পর বসতেন এই ঘরে, সকালের দিকে ঘুঘুডাঙা কোর্টের পাশেই একটা ভাড়ার ঘরে। ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করতেন ট্রেনে। যেতেন ভোর ছটায়, ফিরতেন সন্ধ্যা ছ'টায়। আজীবন।

—তোরা যদি ভেঁবে থাকিস, তোদের জন্য খুব ঘটা করব, সুকুমার তামাশা করে বলল—তাহলে পস্তাবি। শ্রেফ নিরিমিষ ব্যাপার।

—শান্ত ব্যস্তভাবে বলে—ঠিক আছে বাবা। নিরিমিষই খাব।

—খাওয়ার কথা বলছিনে। সুকুমার বলে ওঠে। বলছি ধুম-ধামের কথা। নিজের বাড়ির মত থাকবি খাবি! ব্যাস!

দিব্য একটু হাসে।—শুধু থাকতে খেতে আসিনি। তাই না শান্ত?

শান্ত সায় দেয়। সুকুমার বলে—কেন এসেছিস?

—দেখতে।

—কী?

—তুই কোথায় থাকিস, কেন থাকিস, তাই দেখতে।

—দেখছিস তো! কেমন কাম এ্যাণ্ড কোয়ায়েট লাইফ কাটাচ্ছি। তিনজনে হাসাহাসি করে। তারপর সুকুমার করুণ হাসে।—আমার শালা হঠাৎ এসময়ে জ্বর হয়ে গেল। কত ঘুরতুম। দেখি, এ্যান্টি-বায়োটিক কিছু খেয়ে এখনই জ্বরটা ছাড়াতে হবে।

শান্ত সিরিয়াস হয়ে পরামর্শ দেয়—ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট না করে খাস নে। ভাল ডাক্তার আছে তো এখানে?

—আছেন। হেল্‌থ সেণ্টারে একজন সেকালের এল. এম. এফ. আছেন জগন্নাথ বকসী। এখানেই সেট্‌ল্‌ করেছেন। মোটামুটি ভাল ডাক্তার বলা যায়।

দিব্য জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিল। ঘুরে বলে—তোদের বন্দুক নেই?

—আছে। কেন?

—এমনি।

শান্ত বলে—ও বাঘ মারবে বলে বেরিয়েছে। বাঘ নেই রে?

কখন দরজার কাছে এসে গিয়েছিলেন প্রমথ, শান্তের কথার জবাব দিতে দিতে ঘরে ঢোকেন।—ছিল একসময়। নদীর ওপারে জঙ্গল ছিল-টিল অনেক। এখন তো সব চষে ফেলেছে লোকেরা। পপুলেশান বেড়েছে, খাকতি বেড়েছে। মোটা ভাত-কাপড়ে আর চলে না, বাবা!

শান্ত ও দিব্য উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে। প্রমথ মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়েন।—বসো বসো। সুকু ক'দিন থেকে বলছে, তোমরা আসবে। হঠাৎ জ্বর। ওয়েদারের গোলমাল আর কী। তার ওপর টো টো করে বেড়াল বনবাদাড়ে। রোদ লেগেছে। বসো তোমরা। সুকু, ওদের ঘরে নিয়ে যা। এখানে কেন? বাড়ির ছেলে সব।

—সুকুমার বলে—মদন জল তুলছে। হাত-মুখ ধোবে।

—মদন জল তোলা হল রে? বলতে বলতে প্রমথ বেরিয়ে যান। বাইরে উঁচু খোলামেলা বারান্দা, ওপরে আকাশ। ঠিক বারান্দা নয়, একটা চওড়া চত্বর। দুদিকে ও সামনে বসার জন্য সিমেন্টমোড়া চকচকে বেঞ্চ মত সামনে ধাপ বাঁধা সিঁড়ি। নীচে তিনদিকে বিশাল প্রাঙ্গণ। ঘাসে ঢাকা লন—গেট অবধি একফালি রাস্তায় খোয়া বিছানো আছে। ঘাসের ওপর থরে বিথরে ফুলের গাছে ফুল। পাঁচিলের ধার ঘেঁষে ছোট বড় গাছ, বর্মী বাঁশের ঝাড়, পাতাবাহার ইত্যাদি। সেই বারান্দার ধারে সিঁড়ির মুখে প্রকাণ্ড দুটো বালতিতে জল এনে রাখছে মদন নামে বুড়ো একটা চাকর। পেছনে একটা কুয়োতলা আছে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন প্রমথ। অদৃশ্য মদনকে কিছু বললেন। তারপর খোয়ার ওপর চটির আওয়াজ তুলে গেটে এগোলেন। পরনে ধুতি, গায়ে সাদা হাতকাটা ফতুয়া, পায়ে চটি। প্রাচীন সম্ভ্রমের প্রতীক। ওঁর যাওয়া দেখতে দেখতে শান্ত বলে—তোদের পুকুর নেই।

সুকুমার হাসে।—শহর থেকে কেউ এলে এসব জানতে চায়। আছে বাবা, সে ট্রাডিশন যাবার নয়। পুকুরে মাছ আছে। ভাল জাতের গরু আছে। প্রচুর বিশুদ্ধ দুধ দেয়। বাগান আছে। খামারবাড়ি আছে। বাবা গৃহস্থ মানুষ। একালের ধার ধারেন না। ব্যাঙ্কে টাকা রাখার চাইতে মাটি কেনা সেফ মনে করেন। যা, জল দিয়েছে। এক্সট্রা কাপোড়চোপড় এনেছিস? না আনলে অসুবিধে নেই।

দিব্য বলে—কিচ্ছু আনিনি। কী দরকার?

—ওই ঝোপ পরে এই গরমে কাটাবি? যাঃ।

—এই তো ফ্যান আছে।

—থাকলেও কী। রিল্যাক্স করা যায় না ওভাবে? শান্ত, তুই?

—আমি একটা পাঞ্জাবি আর পাজামা এনেছি। দিব্যটা তো রাস্তা থেকে হট করে চলে এল।

সুকুমার ওঠে। রুগ্নতার প্রকাশ আছে ওর চলায়। কিন্তু ওরা কিছু বলে না।

সুকুমার ভেতরের দরজার কাছে গিয়ে ডাকে খুকু! খুকু!

কেউ তক্ষুনি সাড়া দেয়—কী?

—আমার ঘর থেকে পাজামা-পাঞ্জাবি এনে দে। ওয়াড্রোবের ওপরে আছে দেখবি। ধোপা যেগুলো দিয়ে গেল সকালে।

—আমি একটা কাজ করছি।

সুকুমার একটু রাগ নিয়ে ভেতরে চলে যায়। শান্ত চোখে ঝিলিক তুলে হাসে। চাপা গলায় বলে বুঝলি কিছু?

দিব্য মাথা নাড়ে।

—শালা হিপোক্রিট! সুকুর বোন। কী মেয়েরে!

দিব্য কিছু বলে না। ব্যাগটা সোফায় রেখে বাইরের চত্বরে গিয়ে দাঁড়ায়। দেখে, সিঁড়ির মাথায় দুটো টুল, দুটো মগ, দুটো মস্ত জলভরা পিতলের বালতি, আর একটা টুলে কাচা ভাঁজ করা তোয়ালে ও সাবানের কৌটো রয়েছে। মদন নামে লোকটার চেহারা গরিলার মত। দুহাত ঝুলিয়ে হেঁটে যাচ্ছে বাড়ির পূবপাশে কুয়োতলার দিকে। লোকটা কথা বলতেই জানে না—এমন ভঙ্গী। দিব্য ভেবেছিল, ওকে জিগ্যেস করবে ল্যাট্রিনটা কোথায়।

ভীষণ চাপ। তলপেটে ব্যথা নিয়ে হন হন করে নেমে যায়। বাড়ির পশ্চিমের প্রাঙ্গণে ফুলগাছের ঝোপ প্রচুর। পাঁচিলের ধারে আরও ঘন। তার বাইরে বড়রাস্তা। গাড়ির শব্দ সারাক্ষণ।

সে এদিক-ওদিক দেখে একটা ঝোপের সামনে দাঁড়ায়। তারপর প্যান্টের বোতাম খুলতে গিয়েই শোনে কে বলছে—ওই তো ল্যাট্রিন!

দ্রুত ঘোরে দিব্য। জানলায় সুকুমারের বোনের মুখ। ঘুরতেই সরে যায় মুখটা। তখন দিব্য ডাইনে তাকায়। উত্তর-পশ্চিম কোনায় উঁচু ল্যাট্রিনটা দেখতে পায়—সিঁড়ি আছে। একলা দাঁড়িয়ে থাকা ধবধবে সাদা এক বুড়ো সাধু যেন। এমনি মনে হয় দিব্যর খুব পবিত্র হাবভাব। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে সে। আবার পিছনে ঘুরে সেই জানলাটার দিকে তাকায়। সবুজ গরাদ শুধু। ভেতরে ঘন ছায়ার রহস্য। হঠাৎ রেগে যায় সে। বোতাম খোলে ঝটপট।....

একটু পরে চত্বরে উঠে আসে। শান্ত জামাইবাবু সেজে হাত-পা-মুখ ধুচ্ছে। বরাবর ওর মধ্যে সব ব্যাপারে ভোগী মানুষের নিষ্ঠা ও পারিপাট্য আছে। খেতে বসলেও তাই। এসব মানুষ সচরাচর আইন মানার পক্ষপাতী এবং সীমা ডিঙোতে চায় না—তাই আইনের ফাঁক খুঁজে এগোয়। এই শান্ত তিনটে বিষয়ে এম. এ. দিয়েছিল। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, ইসলামী সংস্কৃতি, এদুটোয় পাশ করেছিল। তৃতীয়বার দর্শন নিয়ে পরীক্ষায় বসে এবং টুকতে গিয়ে ধরা পড়ে সে কি কেলেঙ্কারি! অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে নি। সে চাকরি করতে আগ্রহী না। বাবার হোসিয়ারী আছে। একমাত্র ছেলে। চালিয়ে যাচ্ছে।

দিব্যর মনে পড়ে গিয়েছিল শান্তের পরীক্ষায় টোকার ব্যাপারটা। প্রায় কোন না কোন সময় মনে পড়ে। আপনমনে হাসতে হাসতে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় সে। সুকুমার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে—চৌকাঠে ভর দিয়ে। বেচারার মনের অবস্থা বোঝা যায়। সে দিব্যকে দেখে বলে—ল্যাট্রিনে গিয়েছিলি? সেকেলে কারবার বাবার। গেস্টদের জন্যে অদূরে ল্যাট্রিন করেছেন। এ্যাটাচড প্রিভির কথা শুনলে বাবা ঘেন্নায় শিউরে ওঠেন। বলেন কী জানিস? প্রক্ষালন মোচন এসব ব্যাপার জৈব। কাজেই....

শান্ত হেসে মুখ ঘোরায়।—রাত দুপুরে হিসি পেলে কী করিস রে?

সুকুমার জিভ কেটে বলে—এই! বাবা আসছেন।....দিব্য, তুই বদলে নে। ধোয়া পাজামা পাঞ্জাবি রেখেছি। চমৎকার মানাবে তোকে।

দিব্য খদ্দরের ধূসর পাঞ্জাবিটা তুলে পরখ করে।—গায়ে হবে তো? আমি তোর চেয়ে ইঞ্চি তিনেক উঁচু।

প্রমথ মোক্তার কুয়োতলার দিকে চলে গেলেন। দিব্য ওখানে দাঁড়িয়েই প্যাণ্ট শার্ট ছাড়ল। পরনে শুধু টাইট জাঙ্গিয়া। সুকুমার ফের জিভ কেটে চাপা গলায় বলে—এই ঝটপট।

শান্ত বলে—ও সায়েব। ন্যাংটা হয়ে স্নান করবে কুয়োতলায় দেখবি।

সায়েবই টকটকে ফর্সা রং। দূর থেকে দেখলে দিব্যকে বাঙালী মনে হয় না। সে পাজামায় একটা পা গলিয়ে একবার ডাইনে ঘোরে—অকারণ, তারপর ঠোঁটে চাপা হাসি নিয়ে অন্য পা-টাও গলায়। সুকুমারের বোন বড্ড অদ্ভুত মেয়ে তো।—সেই ভেজা ঝোপটার কাছে গিয়ে কী করছে? একপলকেই বোঝা গেছে, মুখটা দারুণ গম্ভীর। তারপর দৌড়ে ওদিকে অদৃশ্য হয়। পাগলই সম্ভবত। সুকুমারটা নিশ্চয় গোপন করেছে তার বোন পাগলী। অথচ দেখতে কী সুন্দর! সব ভুলে একটু চাপা করুণা আসে দিব্যের মনে।

কিন্তু একটা মজার ব্যাপার ধরা পড়ে যাচ্ছে। সুকুমারের বোন সবসময় যেন আড়াল থেকে এই দুটি আগন্তুকের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। কেন?

সুকুমার তাড়া দেয়। ঝটপট! আমার মাথা ঘুরছে। শুয়ে-শুয়ে কথা বলব তোদের সঙ্গে। চলে আয়।....

বাড়ির ভেতরটা কেমন যেন দুর্গের মত মনে হয় দিব্যের। এক

টুকরো নীচু উঠোন—আয়তক্ষেত্রের গড়ন। তার চারদিকে ঘর। দক্ষিণে বসার ঘর থেকে ঢুকলেই টানা বারান্দা। থাম আছে। উত্তরে ঠাকুরঘর। পূবটাই যা দোতালা। কিন্তু মোটে একটা ঘর দোতালায়। সুকুমারের ঘর।

ঘরটা হালফ্যাশানী আসবাবে সাজানো। বেশ বড় আয়তনেও। পূবে ও দক্ষিণে দরজা। জানালা আছে অনেকগুলো। চমৎকার নকশা কাটা পর্দা ঝুলছে—কিন্তু বাতাসের দাপটও আছে। সুকুমার খাটে শুয়ে পড়েছে। গায়ে চাদর টেনে নিয়েছে। সোফায় হাত-পা ছড়িয়ে বসে সিগ্রেট টানছে দিব্য ও শান্ত। এমন সময় সুকুমারের মা মন্দিরা এলেন। তাকিয়ে দেখার মতো চেহারা। বয়স বোঝা যায় না। টকটকে লাল চওড়াপাড় সাদা তাঁতের শাড়ি, সিঁথিতে প্রচুর সিঁদুর একরাশ ঘনকালো চুলকে সৌন্দর্য দিয়েছে—স্বাস্থ্যবতী মহিলা। ছেলের বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করতে এলেন। সঙ্গে চাকরের হাতে ট্রে। প্লেটে খাবার—নানারকম সন্দেশ, আম। দিব্য ও শান্ত ঝুঁকে প্রণাম করল।—আহা, থাক বাবা, থাক। বেঁচে থাকো। সুখে থাকো সব। সুকু এ্যাদ্দিন কতসব গল্প করেছে তোমাদের। হঠাৎ জ্বর ওর। তাতে কী? এসেছ—নিজের বাড়ি ভেবে থাকবে, ঘুরবে। তা ইয়ে - তুমিই বুঝি শান্ত?

দিব্য বলে—না, আমি দিব্য। দিব্যেন্দু চক্রবর্তী।

শান্ত বলে—আমিই শান্ত, মা। সুকুরা আমাকে অবশ্যি অশান্ত বলে।

মন্দিরা হাসেন।—তেমন কিছু মনে হচ্ছে না বাবা! আমি মা, ছেলেদের চিনি। হ্যাঁ বাবা, পুরো নাম কী যেন তোমার……

—শান্তনীল রায়চৌধুরী।

—তোমার বাবার কী যেন বিজনেস আছে—সুকুই গল্প করে সবসময়।

—আছে। হোশিয়ারী। অবশ্যি আমি কিছু দেখি না—বাবাই সব।

দিব্য মাথা ঘুরিয়ে সোফার পেছনে লুকানো আধপোড়া সিগ্রেটটা খোঁজে। ঝটপট লুকিয়ে ফেলেছিল। ওই তো আছে। মোজাইক করা মেঝে। ফ্যানটা জোরে ঘুরছে, যদিও দরকার ছিল না। সিগ্রেটটা হু হু করে পুড়ে যাচ্ছে।

মন্দিরা ট্রে থেকে প্লেটগুলো টেবিলে রাখতে রাখতে বলেন—তোমার জামাইবাবু শুনেছি বিলেতে থাকেন। তাই না? দিদিও তো ওখানে? সুকু বলছিল।

শান্ত মাথা দোলায়।—হ্যাঁ। দিদি-জামাইবাবু এসেছিলেন মার্চে। আবার আসবেন সেই পুজোয়। জামাইবাবু এঞ্জিনীয়ার তো!

মন্দিরা দিব্যকে প্রশ্ন করেন—তুমি কী করো বাবা? সব বলেছে—মনে নেই। ঝটপট দিব্য বলে দেয়—ব্যাংকে চাকরি করি। বাবা মারা গেছেন। বোনটোন নেই। তিন ভাই। দুজনের একজন বম্বে, অন্যজন দিল্লী। মা বড়দার কাছেই থাকেন, দিল্লীতে। কখনও আসেন আমার কাছে। বছরে বার দুত্তিন।....তারপর হেসে ওঠে। ফের বলে—আমি মায়ের সুপুত্র নই!

—বালাই! বলতে নেই। বলে মন্দিরাও তিরস্কারের ভঙ্গীতে হেসে ওঠেন।....তবে কী জান বাবা? দস্যি ছেলের দিকেই মায়ের টান বেশি।

দিব্য ভাবলেশহীন মুখে বলে—আমার মা উল্টো বলেন। আমি আঁতুড়ে মারা গেলেই খুশি হতেন!

সুকুমার মুখটা ঘুরিয়ে নেয়। দিব্য কোথাও মানিয়ে চলতে জানে না। ওর কী যে স্বভাব! আর, শান্ত দিব্যকে চুপি চুপি খোঁচা দেয়। দিব্য গ্রাহ্য করে না।

মন্দিরার মুখেই হাসিটা কেমন বদলে গিয়েছিল যেন। কিন্তু তক্ষুণি জোরে আবার হাসেন—বুদ্ধিমতী মহিলা তিনি। বলেন—ও কথা কি বলতে আছে, ছেলে? মায়ের মন তোমরা ছেলেরা কী বুঝবে বল?....হ্যাঁ, এসব আমাদের বাগানের আম। গাছপাকা আম। সব খাবে কিন্তু। ভাল লাগলে.....

দিব্য বলে—আরো চাইব। ভাববেন না! সুকু জানে, আমি বড্ড পেটুক।

মন্দিরা বলেন আচ্ছা, আচ্ছা। দেখা যাবে ছেলে কেমন পেটুক। তারপর দরজার দিকে ঘুরে বলেন—তুই হাঁ করে কী দেখছিস? জলের গেলাস নিয়ে আয়। আর মালুকে বল্, চা হল নাকি।

সুকুমার বলে—খুকুকে চায়ের চার্জ দিয়েছ? ব্যাস, তাহলেই হয়েছে!

মন্দিরা কান করেন না সে কথায়। বলেন—আমার বাবা হার্টের একটুখানি গণ্ডগোল আছে। ওঠা-নামা করা বারণ। ওপরে দেখতে এমন—শুধু খোসা। সুকু, জগাকে সবসময় থাকতে বলেছি তোর এখানে। জগা, থাকবি। কই চল, দেখি মালু কী করছে!

—খুকুর মেজাজ কেন এমন হল, বল তো? সুকুমার বলে।

—ঝগড়া করছিস নাকি?....বলে হাসতে হাসতে পা বাড়ান মন্দিরা।

দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে বলেন—তাহলে ছেলেরা, আমি যাই। নিজের বাড়ির মত থাকবে। অসুবিধে হলে বলবে। লজ্জা কোর না সব। সুকু, জগা থাকবে। ছোঁড়া বড্ড ফাঁকিবাজ। দেখবি। এ্যাই ছোঁড়া! আবার হাসি হচ্ছে দাঁত বের করে? চল্, জল নিয়ে আসবি। আর ছোটবাবুর দরজা থেকে নড়বিনে বলে দিচ্ছি।....

মন্দিরা চলে গেলে শান্ত বলে—তোর মা, রিয়েলি সুকু, অসম্ভব—

মানে রিয়্যালি দারুণ ভালো রে! এমন মা পেলে—ওঃ! কী না যে করতুম!

দিব্য বলে—পাঁচটা সাবজেক্টে এম. এ দিতিস! শালা এম এ টি ম্যাট!

প্রাণ খুলে হাসে শান্ত। তারপর সুকুমারকে বলে—এম. এ.র পর ওই টি টা কী বুঝতে পারছিস তো সুকু?

সুকুমার বলে—টুকলিফাই? টুকে পাস? তাই না?

তিনজনেই হাসে। তারপর দিব্য বলে—হ্যাঁরে সুকু, শান্তর বাবার গেঞ্জির কারবার আছে, এটা তোর মাকে বলেছিলি কেন রে? তোদের বুঝি গেঞ্জির দরকার হয় খুব?

সুকুমার অপ্রস্তুত হয়ে বলে—না, এমনি। ক্যাজুয়ালি। মা আবার সব খুঁটিয়ে জানতে ভালবাসেন কিনা।

—তাহলে তোর দাদামশাই নির্ঘাৎ বিগ বিজনেসম্যান ছিলেন?

—হ্যাঁ। পুঁজিপতি বলতে পারিস। অভ্রের খনিও ছিল একটা। নীচের ঘরে ছবি আছে- দেখবি।

দিব্য সন্দেশ গালে পুরে বলে—নাও, শালা এখন আঙুল শোঁকাবে। মাইরি, তোরা সুকু পাড়াগাঁর ছেলেরা যেন কী। এলুম ঘুরতে....

শান্ত বলে ওঠে—এবং চরতে।

দিব্য বলে যায়—হ্যাঁ! গায়ে জ্বর বাধাল। তারপর ঘোরো ঘর থেকে ঘরে—ফ্যামিলিহিস্ট্রী শোন। বাপস্!

সুকুমার অগত্যা বলে—তুই বড় এ্যাগ্রেসিভ সবসময়। যাঃ!

অন্তত একমিনিট চুপচাপ থাকে সবাই। বাইরের বাতাস পর্দা ফাঁক করে বারবার এবং গ্রামীণ আকাশ, গাছপালা, ঘরবাড়ী ওতপ্রোত একটা অখণ্ডতা বারবার ভেসে ওঠে। কাক ও চড়ুই শব্দ করে কার্নিশে। কেমন যেন নির্লিপ্ত প্রাণহীন আর উদাস সময় বয়ে

যায় এখানে—একঘেয়ে। দিব্যের হঠাৎ সব তেতো লাগে। সুকুমাররা এখানেই জন্মেছে, বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং এখানেই মরতে ভালবাসবে। শান্তের মনে অন্য কথা। সিঁড়িতে হাল্কা পায়ের শব্দ কখন শুনবে, ওই শব্দটা সম্পূর্ণ অন্যরকম—পৃথিবীর কোন শব্দের সঙ্গে মিল নেই, সে স্পষ্টই চিনবে কে আসছে।

তারপর দিব্য জল খায়। খেয়ে বলে—রাগ করলি সুকু? হোস্ট তুই।

তখন সুকুমার জোরে হাসে।—আমিই এ্যাগ্রেসিভ। যাক্ গে, শোন্। চা খেয়ে তোদেব নিয়ে বেরোব।

শান্ত ব্যস্ত হয়ে বলে—জ্বরগায়ে? না—না! শুয়ে থাকবি।

—বলছি, শোন না! যাব রিকশো করে। আগে ডাক্তারের কাছে! তারপর....

—উঁহু। ডাক্তারকে ডেকে পাঠা।

—হেল্‌থ সেণ্টার ছেড়ে এখন ওঠার সময় নেই ডাক্তারের। উঠবেন সেই একটায়। লাইন দিয়ে আছে বাহান্ন হাজার পেশেণ্ট। ছেড়ে এলে দরখাস্ত চলে যাবে হেল্‌থ ডিপার্টে।

শান্ত চিন্তিত মুখে বলে—সত্যি! তোদেব—মানে, পাড়াগাঁয়ে ডাক্তার ইজ এ প্রব্লেম। এখন মনে হচ্ছে কেন যে শালা ডাক্তারিটা পড়িনি। মামার পরামর্শ ছিল—অথচ আমার মাথায় ভুত চাপল।

সুকুমার বলে—ডাক্তারি পড়ে তুই গাঁয়ে আসতিস? আহা—চাঁদ!

—আলবাৎ আসতুম!

দিব্য বলে—বিশেষ করে সুকুদের গাঁয়েই।

সুকুমার বলে—কেন?

শান্ত দিব্যের কথার মানে টের পেয়েছিল। একটু রেগে বলে—তুই একটা ননসেন্স।

দিব্য বলে—গাঁয়ের জামাই হয়ে আসত নির্ঘাৎ। ভাবা যায় না।

শান্ত বালকের মত লজ্জায় কাঁচুমাচু হয়ে পড়ে। সুকুমার কিছু না ভেবেই হাসে। শান্ত চাপা গলায় বলে ওঠে—স্থানকালের সেন্সও নেই তোর!

এইসময় সিঁড়ির দিকের দরজার পর্দা তুলে ধরেছে জগা নামে চাকরটা। চায়ের ট্রে দু'হাতে নিয়ে মধুমালা ঢুকছে। ঘরে পা বাড়িয়েই ঘোরে সে। জগাকে কড়ামুখে বলে ওঠে—পর্দা সরাতেও জানিস নে? এক্ষুনি পুড়ে যেতুম না? বুদ্ধু কোথাকার! আবার দাঁত বের করে হাসছিস যে?

সুকুমার বলে—ঢুকতে ঢুকতে ঝগড়া! তোর হয়েছেটা কী, শুনি?

থমথমে গম্ভীর মুখে মধুমালা সোফার সামনের টেবিলে ট্রে রাখে এবং চলে যেতে পা বাড়ায়। সুকুমার বলে—এ কী! চা ঢেলে দে! চলে যাচ্ছিস কেন?

দিব্য বলে—আপনি বেশভূষা বদলেছেন মনে হচ্ছে?

মধুমালা সপ্রতিভ জবাব দেয়—আপনারাও বদলেছেন। তারপর পা বাড়ায় ফের।

সুকুমার ব্যস্তভাবে উঠে বসে।—খুকু, পরিচয় করিয়ে দিই তোর দাদাদের সঙ্গে।

মধুমালা দাঁড়িয়ে পড়ে। শান্ত বলে—দাঁড়িয়ে কেন? বসুন না।

সুকুমার বলে—ওকে আপনি-টাপনি করছিস কেন রে? ছোট-বোনকে আপনি। তুই বলবি। খুকু বোস।

দিব্য গম্ভীর হয়ে বলে—উঁহু। শী ইজ কোয়াইট এ লেডি! তুই ব্যাটা জানিসনে—আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ চলেছে। খবরের কাগজ পড়িস? আসে এখানে?

সুকুমার বলে—ক্যালকেশিয়ানগিরি ছাড়। আজকাল সারা

[illegible] কলকাতা। কলকাতা আর কলকাতায় নেই। খুকু, এ [illegible] চক্রবর্তী। আর এ শান্তনীল রায় চৌধুরী। বলেছিলুম, চিবুকে দাড়ি থাকবে।

শান্ত দাড়ি খামচে ধরে কৌতুকের ভঙ্গী করে।—দ্যাটস স্ট্যাটাস সিম্বল!

মধুমালা বলে—আপনারা অত ইংরিজি বলেন কেন? বাঙালী না?

ঘর ফেটে পড়ে তিনটি পুরুষালি হাসিতে। শান্ত হাততালি দিয়ে বলে সুকু! এ মাইরি জয়বাংলা! মানে ওপারে জন্মালে নির্ঘাৎ রোশেনারা হত!

দিব্য বলে—বাঙালী-বাঙালী ভাবটা মাঝে মাছে ভালই লাগে। জয়বাংলা। মধুমালা ভুরু কুঁচকে একটা কড়া কথা বলতেই যেন তৈরী হয়—কিন্তু বেমক্কা এসে পড়েন কোবরেজ মশাই। পর্দা তুলে জগা তখন একই ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে তাঁর মূর্তিটি ভেসে ওঠে —কই সুকু? মোক্তারমশাই বলছিলেন—জ্বর হয়েছে সুকুর। শুনেই চলে এলুম। কী জ্বর? কেমন জ্বর?

ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ান।....ও। এনারা বুঝি কলকাতা থেকে এসেছেন? তাই নাতনী তখন স্টেশনে যাচ্ছিল। নমস্কার, নমস্কার।

দিব্য ও শান্ত নমস্কার করে। হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। মূর্তিমান রসভঙ্গ। সেই ফাঁকে মধুমালা কেটে পড়ে। কোবরেজমশাই খাটে গিয়ে বসেন। সুকুমারের হাত টেনে নিয়ে পরখ করতে থাকেন। ঘরে আবার স্তব্ধতা। সুকুমার খুবই গম্ভীর। বাবার ওপর রাগ হয়েছে। শান্ত তার দিকে চোখ টেপে। দিব্য উঠে যায় দক্ষিণের দরজায়। বাইরে টানা ছাদ। এলাকাটা অনেকখানি দেখা যায়। গাছপালার জটলা—তার মধ্যে বিদ্যুতের তার। দূরে চকচক করছে

পীচের সড়ক—উঁচু হতে দিগন্তে মিশেছে। ট্রাক বাস সাইকেল রিকশো চলছে। হঠাৎ পৃথিবীটা খুব বড় লাগে দিব্যির—হঠাৎই মনে হয়, এখনও কতকিছু জানার ও দেখার আছে যেন। সব বিরাট ব্যস্ততা, হইচই, ভয়ঙ্করতম শব্দ চাপা দিয়ে খাঁ খাঁ শূন্যতার গ্রাস ওখনও কোথাও স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাবে—সেখানে মানুষ ইচ্ছে-অনিচ্ছে কামনা-বাসনা হিংসা বা পাপের মূল্যই ধরা হয় না। হয়তো সেখানেই প্রকৃতি।...

এবং দিব্যির মনে হয়, যে ব্যাপ্তি চোখের সামনে দেখছে—তা তার মত মানুষকে খুব সহজেই অচিহ্নিত করে দিতে পারে। নিজের বুকে লুকিয়ে ফেলতে পারে। পৃথিবীটা এত বড় এর আগে টের পায়নি তো।

সে আশ্বস্ত হয়ে নিশ্বাস ফেলে।....

* * *

মধুমালা নীচে গিয়েই বেরিয়ে পড়ে বাড়ি থেকে। চওড়া রোয়াক থেকে নেমে ডাইনে ঘুরে প্রাঙ্গণে ঢোকে। চাঞ্চল্যটা জোর বেড়ে চলেছে মনে। কী একটা অস্থিরতায় ফুলছে। শেষ রাতের সেই স্বপ্নের প্রতিক্রিয়া আর নেই। কিন্তু নতুন উপদ্রব ঘটেছে। বেশ তো ছিল সব—হঠাৎ বেমক্কা কারা এল, ব্যালান্স নষ্ট হল, একটা পুরনো দুর্গের ওপর হামলা চলার মতো।

সেই কামিনী ঝোপটার সামনে দাঁড়াল সে। নাকে আঁচল ঢাকা। অসভ্য সব। গাছের গোড়াটা এখনও ভিজে আছে। বিষ! মরে যাবে না তো গাছটা? এসব গাছের সঙ্গে মধুমালার মন জড়িয়ে আছে—নিবিড় ও গভীর সেই জড়িয়ে থাকাটা। এগুলো সে নিজের হাতে পুঁতেছে। নিজে জল দেয় দুবেলা। নার্সারি থেকে সার নিয়ে আসে। নতুন-নতুন চারাও আনে। কিছু মরে যায়, কিছু বাঁচে ও বেড়ে ওঠে। ফুল ফোটে। যে বোগেনভেলিয়াটা জানলার

ওপরে জাঁকিয়ে বসে, লাল সাদা দুরকম ফুল ফুটেছে—তারই লাগানো। কেমন করে দিনেদিনে গাছ বাড়ে, নতুন ডালের আঁকুর গজায়, পাতা আসে, কুঁড়ি ধরে ও ফুল ফোটে—সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে। দেখলে অবাক লাগেনা ব্যাপারটা! কোত্থেকে আসে ফুল? গত বর্ষায় লাগানো যুঁই ও বেলি মস্তো ঝাড় হয়ে ফুলে ভেঙে পড়ছে। সন্ধ্যাবেলা ম ম করে গন্ধে। কত কী মনে পড়ে যায়—কত কী ইচ্ছে জাগে। মনে হয়, কী যেন ঘটবে জীবনে—খুব শিগগির, হয়তো কাল কিংবা পরশু। কিছু ঘটবে—যা ভারি ভাল, দারুণ সুখের। সুখ কী তা বোঝে মধুমালা। তার এই সুখ যেন মায়ের সুখ।....

রাগে আবার জ্বলে ওঠে সে। রোদ বেড়ে গেছে। এখন জল ঢালা উচিত কিনা বুঝতে পারে না। অথচ ওই অপবিত্রতা থেকে কামিনী গাছটাকে মুক্ত করতেই হবে। দেখ না গাছটা বিব্রত মুখে দাঁড়িয়ে আছে। যেন বলছে—আমাকে চান করিয়ে দাও শিগগির। রামোঃ।

আজকাল কী সব বিচ্ছিরি নির্লজ্জ অভ্যাস লোকের—দাঁড়িয়ে ওই কম্মটি সেরে নেয়। স্কুল যাবার পথে ওই নিয়ে মেয়েরা কত হাসাহাসি করত। কেউ বলত প্যাণ্ট পরা লোকের পক্ষে বসাটা কষ্টকর। তাই। আহা বেচারা! আবার খিলখিল হাসি।

কিন্তু বরাবর কলকাতার লোকের ওপর মধুমালার রাগ। ঠিক কবে থেকে এই রাগের শুরু মনে নেই—শুধু মনে হয় ওরা বড্ড চালিয়াৎ। কেমন চোখে তাকায় দেখেছ? যেন সবজান্তা মহাপুরুষ। এঁচোড়ে পাকা হাবভাব। দাদার বন্ধুরা বরাবর এসেছে কলকাতা থেকে। সুকুমার এম. এ. পড়ার সময় ওখানে হোস্টেলে থাকত। ছুটিছাটায় ওর সঙ্গে কেউ কেউ আসত। একেকটি একেকরকম সং যেন। সবতাতেই হাসি, ঝটপট মন্তব্য, হুল্লোড়। জগার কাছে

শুনেছিল, দাদা ও বন্ধুরা নাকি রাতে লুকিয়ে বিলিতী মদ খায়। দাদা মাতাল হয়, এটা অবিশ্বাস্য। জগাকে ধমকেছিল মধুমালা—খবরদার, আমি শুনলুম, শুনলুম। ব্যস্! খুব ভয় ছিল, ছোঁড়াটা যা ভ্যাবলা! কথা চাপা রেখেছে জগা। আজ অব্দি কেউ টের পায়নি। কিন্তু মধুমালার খালি মনে হত, দাদা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। রামবাবুর ছেলের মত কবে রাস্তায় মাতলামি করবে! ইস, ভাবা যায় না! মাতালদের খুব ভয় আর ঘেন্না করে যে মধুমালা। রাস্তাঘাটে মাতাল দেখলে খুব ছেলেবেলায় ভয়ে সিটিয়ে যেত। একবার স্কুল থেকে ফেরার পথে হরেন বাবু মাতাল হয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন—দুহাত তুলে। অমনি দিশেহারা হয়ে ফ্রকপরা মধুমালা পালিয়েছিল, গাঁ ছেড়েই বলা যায়—মাঠ দিয়ে নদীর ধারে ধারে ঘুরে বাড়ি ঢুকতে সন্ধ্যা। সেদিনের আতঙ্ক এখনও মন থেকে যায় নি। তাই দাদার মদ খাওয়া নিয়ে তার আপত্তি হয়েছে। ভেবেছে, চোখ বুজে ওকে বলে ফেলবে কথাটা—নিষেধ করবে। কিন্তু পারে নি। দাদাকে অন্যসব ব্যাপারে যত কড়া কথাই বলুক, দাদার সামনে দাঁড়ালে এখনও দাদাকে দেবতার মতো লাগে। দাদা তো টের পায় না, তার বোন তার জন্যে প্রাণ দিতে পারে হাসিমুখে। মায়ের কাছে শুনেছে, তিন তিনটে সুন্দর সুন্দর খোকার পর সুকুমার এল কোলে। কত মানত, কত পুজোআচ্চা, কত ধর্নার পর বেঁচে আছে সে। এম. এ পড়তে দূরে যেতে হবে বলে মায়ের সে কি কান্নাকাটি! মধুমালাও তো কত কেঁদেছিল গোপনে। সব গুছিয়ে সুকুমার বেরুচ্ছে, খুকু কোথায়? খুকুর পাত্তা নেই। মদন বলে—দেখুন গে, ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে—বাগানে। জবাফুলের ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে কাঁদছিল খুকু। চোখ দুটো ভেসে যাচ্ছে, এত কান্না।.....

তারপর তো সুকুমারের এম. এ. পড়া শেষ হল। বাড়ি ফিরে এল। তারপর প্রায় এই একটা বছর ওর কোন বন্ধুবান্ধব আর

আসেনি। হঠাৎ এতদিনে এই দুজনের আবির্ভাব। চিবুকে দাড়ি যার—তাকে মানিয়ে নেওয়া যায়, গায়ে পড়া ভাব আছে এবং ভদ্র বলেই মনে হচ্ছে—কিন্তু ওই ঢ্যাঙা ফর্সাটা যেন কেমন। গম্ভীর-গম্ভীর ভাব—মেপে কথা বলে। ভদ্রতার ছলে কূট কাটে। আর চাহনিটা কেমন যেন ভাসা-ভাসা—একটা বিশাল ফাঁকা, তোমাকে দেখছে অথচ দেখছে না—গ্রাহ্য করেও করছে না। নির্বিকার মুখ। দেখ না, কেমন বেপরোয়া এত চমৎকার ফুলগাছটার গোড়ায় প্যান্টের বোতাম খুলে····নির্লজ্জ কোথাকার! দাদার বন্ধু না হলে এবং এ বাড়ি না হলে বিচ্ছিরি অপমান করে ফেলত মধুমালা।

মধুমালা ছটফট করে এগিয়ে যায় জানলার কাছে। চেঁচিয়ে ডাকে—মদনদা! মদনদা আছে? মা! মা!

জানলাটা খাবার ঘরের। ডাইনিং টেবিল আছে, আবার পিঁড়ির ব্যবস্থাও আছে। ওপাশেই কিচেন। কিচেন ও কিচেনের বারান্দায় জোরালো আয়োজন এবং ব্যস্ততা। কলকলানি শোনা যাচ্ছে। ঝি-ঠাকুর-চাকর কলকল করছে। এর কোন মাথামুণ্ডু নেই। মাঝে মাঝে কর্ত্রীর গলাও শোনা যাচ্ছে। মধুমালা বিরক্ত হয়ে বলে—যেন ভোজ লেগেছে। শ্রাদ্ধ হবে। বাব্বাঃ! এত ডাকছি, সাড়া নেই। মা! মদনদা!

ভেতরে মন্দিরা শুনে বলেন—দেখ তো মালু কেন ডাকছে!

কেউ বলে—মদনকে ডাকছে। মদন, ডাক পড়েছে রাজকন্যের! যাও, মাথা কাটবে।

তারপর অনেকগুলো হাসি। কথাটা বলেছে চারুঠাকুর। রোস, দেখাচ্ছি মজা। তারপর মদন এসে উঁকি মারে।

—হাঁ, করে কী দেখছ? এক বালতি জল আন। গাছ ধোব।

হুকুম দিয়েই মধুমালা আবার কামিনী ঝোপের কাছে চলে আসে। দুঃখ ও রাগ নিয়ে তাকায়। মনেমনে কথা বলে গাছটার সঙ্গে।

—লক্ষিসোনা! একটুখানি থামো। তারপর তোমাকে ছোঁব। গাছটা যেন খুশিতে নড়ে ওঠে। শনশনিয়ে বাতাস আসে। শাখায় পাতায় ব্যাকুলতা নিয়ে এই বাগানের মালিনীর দিকে তাকিয়ে থাকে। যেন বলে—তোমাকে আমরা ভালবাসি।....

দিব্য ঘুরতে ঘুরতে তখন দক্ষিণের ছাদ হয়ে পশ্চিমের ছাদে। সাড়ে তিনফুট উঁচু কার্নিশের দেয়ালে শরীর ঠেকিয়ে নীচের বাগান দেখছে। মধুমালার কাণ্ড দেখছে। মধুমালা জল ঢালছে একটা গাছের গোড়ায়। দিব্য বুঝতে পেরেছে, কেন। সে প্রথমে হাসে। তারপর গম্ভীর হয়। তারপব নির্বিকার তাকিয়ে থাকে। উদ্দেশ্যহীন।

খালি বালতিটা হাতে নিয়ে ঘোরে মধুমালা। তারপর মুখ তুলে দেখতে পায় দিব্যকে। একটু চমক খায়। সেই অপ্রতিভ ভাবটুকু যেন ঢাকতেই ফিক করে হেসে ওঠে।

সূর্য দক্ষিণে ঘুরেছে একটু। পূবদক্ষিণ কোণায়। মধুমালা দাঁড়িয়ে পড়েছে। সে উত্তর-পশ্চিমে। সবলরেখায় তীব্র আলো তার মুখে গিয়ে ভেসে যাচ্ছে, গড়িয়ে পড়ছে যেন। উজ্জ্বল মুখ এবং ছোট্ট একটু হাসি।

দিব্যের চোখ—বিশাল দৃষ্টি জ্বলে যায় মুহূর্তের জন্যে। কী সুন্দর মেয়েটা। আর অত উঁচুতে ছাদের ধারে আকাশের বুকে একটা ফর্সা ঢ্যাঙা মূর্তি, পাঞ্জাবি জোরালো বাতাসে কাঁপছে, মধুমালার মনে অসচেতন একটা বিহ্বলতা ছুটে আসে, একটা ঝিলিকের মতো—এবং হঠাৎ তার মনে হয়—কে ও? এবং তক্ষুনি সে লজ্জায় কাঠ হয়ে যায়।

মুখ নামিয়ে প্রায় দৌড়ে খিড়কির দরজার দিকে চলে যায় সে। খালি মনে হয়—কী যেন ঠিক হয়নি, উচিত ছিল না এমনটা।

আর দিব্যের চোখে মেয়েটা তখনও ধরা! উজ্জ্বল সৌন্দর্য একটা। যেন পৃথিবীর কেউ নয়। ভিড়ের নয়। রাস্তার নয়।

নির্জনতার ও স্তব্ধতার। গাছপালার শ্যামল শরীর থেকে বেরিয়ে আসা কেউ—যে কতকাল আগে জন্মেছে, মৃত্যুহীন। তার জন্যে কি কোন প্রতিশ্রুতি ছিল ?....

তাবপব ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে। রাস্তাটা দেখা যায় না গাছেব আড়ালে। গেটেব দিকে ঘোরে। জিপেব শব্দ কি ? জিপটা....না, সামনে দিযে চলে গেল। সরকারী জিপ বলে মনে হচ্ছে। কোথায গেল ? ওদিকটা গাঁযের ভেতর। ধোঁয়া উডছে কোথাও। পাখি চক্কব দিচ্ছে। জিপের আওয়াজ বুকের ভিতর গবগর করতে কবতে মিলিযে যায।

ও কিছু না, বলে দিব্য সবে আসে। বেরোতে হবে, ঘুরতে হবে টোটো করে—এবং সেইসব নির্জনতায় ভাবতে হবে নিজের ভবিষ্যৎ। এমনভাবে চুপচাপ খেতে আর সুকুমাবের নির্বোধ কথাবার্তা শুনতে সে আসেনি।

ঘরে তখনও সেই বুডো লোকটা বসে আছে। বকবক করছে শান্তের সঙ্গে। শান্ত বলছে—আপনি ঠিকই বলেছেন দাদু। আমি তো এ্যানসিয়েন্ট ইণ্ডিয়ান হিসট্রির ছাত্র। আযুর্বেদ যে কী, ভাবা যায় না। গভমেণ্ট বিসেণ্টলি এসব স্কিমটিম করছে। কত আগে করা উচিত ছিল। আপনাকে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দিতে বাধ্য। দরখাস্ত করে দিন। স্কিমটার কথা আমি জানি। প্রতি ব্লকে একজন হোমিওপ্যাথ, একজন এ্যালোপ্যাথ, একজন আযুর্বেদী.....

দিব্য বলে—ইয়ে, সুকু ! তোদের বন্দুকটা দিবি ? বেরোব।

সুকুনার বলে—তুই....হ্যাঁ। তুই তো রাইফেল ক্লাবের মেম্বার ছিলি। ভুলে গিছলুম। দাঁড়া, ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। মদনকে দিচ্ছি সঙ্গে। নদীর ওপাবে চলে যাবি। ভ্যাট ! আমার হঠাৎ জ্বর হয়ে গেল।

॥ তিন ॥

ঘন গাছপালা ঘেরা জায়গাটা। মধ্যে একটা ডালপালা ছড়ানো বট দাঁড়িয়ে আছে সবার ওপরে। একটা পুরনো মন্দিরের গা ফাটিয়ে সে উঠেছে। মন্দিরের ছোট ইট দেখেই বোঝা যায় বহুকালের। একটা পাথরের ফলক আছে দরজার ওপর। পড়া যায় না। ভিতরে কোন মূর্তি নেই। ইটের স্তূপে ঝোপ গজিয়েছে! সামনে খানিকটা তকতকে ঘাসবিহীন মাটি। উঁচু একটুকরো বারান্দায় ইটের টুকরো, ধ্বসের সব লক্ষণ জড়ো। তার উপর ছোটছোট মাটির ঘোড়া, পিদীম, শুকনো ফুল, সিঁদুরের ছোপ।

প্রণাম সেরে মদন বলে—ইনিই আজ্ঞে কপালীতলা! এখন পিতিষ্ঠা হয়েছেন গাঁয়ের মধ্যিতে।

দিব্য দোনলা বন্দুকটা কাঁধ থেকে নামায়। মাটিতে কুঁদো রেখে নিজের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড় করায়। এখন হঠাৎ গুলি ছুটলে চিবুকের তলা দিয়ে মগজ ফুঁড়ে বেরোবে। কিন্তু অটোমেটিক নয়। সে সিগ্রেট ধরায়। একটু হেসে বলে—তুমি ভূত দেখেছ, মদন?

মদন হাসে। দেখেছে, তা বলার জন্য তৈরী হচ্ছে বোঝা যায়। এই লোকটা বড় অদ্ভুত। বাড়িতে কেমন নির্বাক যন্ত্র মনে হচ্ছিল। নদী পেরিয়ে আসাঅব্দি তেমনি থেকেছে। তারপর এই জঙ্গলে ঢুকেই মুখ খুলেছে তো খুলেছে—কিছুতেই থামছে না। একেবারে বাঘা গাইডদের একটি গ্রাম্য নমুনা। মনে হচ্ছে, এই সব জনহীন জায়গায়, উদ্ভিদ ও মনুষ্যেতর প্রাণীদের সব খবর তার জানা। সে যেন এদেরই কেউ। সুকুমারদের লোক। সুকুমার জানে বলেই ওকে

পাঠিয়েছে, তা বোঝা যায়। প্রতিবার পা ফেলছে, আর একটা করে নৈসর্গিক ঘটনা—যা নিসর্গে ঘটে এবং ঘটেছে, তার নিপুণ বর্ণনা দিচ্ছে। একটু আগে শিরিস গাছটার ডালে হনুমান মারার গল্প শুনিয়েছে। ওখানে একটা কেয়া ঝোপের বাসিন্দা একটা সাপের কথাও বলেছে। বলেছে কবে একটা শেয়াল দাঁত ছরকুটে মারা পড়েছিল প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টিতে। অথচ এই লোকটা মানুষের পরিবারে ও ভিড়ে বোবা হয়ে যায়! কেন?

মদন ভূতের গল্প শোনায়। ঠিক ভূত নয়, ডাকিনীর। এই বটগাছে একটা ডাকিনী দেখেছিল। জ্যোৎস্নারাতে উলঙ্গ শরীরে চুল খুলে বসে চেরা গলায় গান গাইছিল। দুঃখের গান। এই ডাকিনীটার যে কামিখ্যে ফেরা হয়নি—আটকে পড়েছিল এখানে। সে আলাদা গল্প।....

শান্ত এল না। ও এইরকমই। বলল—বাপ্‌স! জঙ্গলে মাঠে এই রোদ্দুরে ঘোরা আমার পোষাবে না। তুমি যাও—তুমি তো এক্সপার্ট গানম্যান এবং..... সুকুমার ঠাট্টা করে বলল—এ্যাণ্ড গ্যাংস্টার!

—আলবাৎ! শালার কট্টুকু তুই জানিস সুকু? খাঁটি মেকসিক্যান মাল, মাইরি। দুহাতে রিভলবার চালাত সিক্সটি সেভেনে। তখন বাঞ্চোৎ ছিল একটা পলিটিকাল পার্টির এ্যাকশান-স্কোয়াডে। কিন্তু কী ভাবে পরে যে সব ম্যানেজ করে বেরিয়ে এল, ভাবা যায় না! একেবারে উইদাউট এনি স্পট—মাইরি! সে সব তুই জানিস নে। বলব'খন।

—আত্মীয়টাত্মীয় নিশ্চয় পুলিশের বিগ গাই ছিল?

—আই থট দ্যাট। শালা তো বলবে না খুলে! এ্যাই দিব্য, খালি হাতে ফিরলে কিন্তু বন্দুক কেড়ে শুট করব জেনে রাখ্। যা—উইশ উই গুড লাক।

দিব্য একটু হেসে চলে এসেছে। শান্ত কিসের যেন তালে আছে। আবছা মনে হয়েছে তার। ওই তো এতটুকু মেয়ে, বন্ধুর ছোট-বোন—সেন্স নেই শালার। হঠাৎ দিব্যের মনে পড়ে যায়, সুকুমারের মা যেন খুব ইন্টারেস্টেড শান্তের ওপর। জামাই করবেন নাকি! ওই বেঁটে দেড়েল ক্লাউন ফুলপরীটাকে বিয়ে করলে কুকুরের মত গুলি করব বাঞ্চোৎকে! এদিকে বয়সের গাছপালা নেই, প্যাণ্টে সাতটা পকেট নিয়ে ঘোরে—ওদিকে বাবা গেঞ্জির কারবারী!

দিব্যের মাথার ভিতরে মৌমাছি ঢুকে পড়েছিল। নদীর ধারে এসে সেটা ফুড়ুং করে বেরিয়ে গেছে। কী সুন্দর নদী। খাত ভরতি সোনালি বালি, তার মধ্যে রাস্তা খুঁজে খুঁজে একফালি ভীতু কালো স্রোত এগিয়ে গেছে বাঁকের দিকে—ওখানে রেলব্রীজ আছে। আসার সময় ট্রেন থেকে দেখতে পেয়েছিল। ভাল লেগেছিল। কেন নদী দেখতে ভাল লাগে মানুষের? পাহাড় সমুদ্র আকাশ বন এবং জীবজন্তু? মানুষ তো এখন হাড়েমজ্জায় পুরো শহরের প্রাণী। ভিড়ে বেঁচে আছে। ভিড়ে খাচ্ছে ঘুমোচ্ছে বেড়াচ্ছে। বেশ আছে সব। অথচ হঠাৎ মাঝেমাঝে হার্টে খেঁচুনি অথবা মগজ কামড়ানো কী এক ব্যথা দপ দপ করার দরুন ছুটিছাটায় ছোটো নদী সমুদ্র আকাশ পাহাড় বনে—দ্বীপপুঞ্জে তুষারে, কাশ্মীরে নৈনিতাল এলিফ্যাণ্টা গুহা। নস্টালজিয়ার কারবার। নেচার টানে।

—বাবু, বাবু হরিয়াল!

হঠাৎ অরণ্যমানুষটা ওর বাহুর কাছটা উত্তেজনায় চেপে ধরে, দিব্য এত চমকেছিল যে বন্দুকটা পড়ে যেত এবং হয়তো সেফটি ক্যাচে চাপ লেগে গুলি বেরিয়ে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেত। একজন মরত, তাতে ভুল নেই। পয়েণ্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জে পাখি মারা ছররাও মরটাল ডোজ।

বিরক্ত দিব্য অভিজ্ঞ হাতে খপ করে নলটা ধরে সামলায়। এ

ব্যাটা কেমন করে জানবে হরিয়াল মারা বেআইনী। বন্য পশুপাখি সংরক্ষণ আইনের আওতায়, ঘুঘুজাতীয় পাখি হরিয়ালও পড়ে। অবশ্য এই গ্রামাঞ্চলে আইন ব্যাপারটা কতটা উদ্ভট, দিব্যের কিছু অভিজ্ঞতা আছে। সাতষট্টিতে মেদিনীপুরের গ্রামে কয়েকটা মাস ঘুরেছিল। তখন অন্য দিব্য সে। দিনের পর দিন একইভাবে একঘেয়ে কথাবার্তা আর কাজে সে ক্লান্ত হয়েছিল। ঘেন্না ধরে গিয়েছিল। সবটা যেন নিছক এ্যাডভেঞ্চারের ভঙ্গী। তার রক্তে এ্যাডভেঞ্চারার হওয়ার ব্যাপারটা নেই। সে আবিষ্কারক হতেও চায় না। পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এত কিসের অহঙ্কার কিছুতেই তার মাথায় ঢোকে না। দুর্গম জায়গায় অভিযান—মেরুবিজয় যেমন, এতে কি ক্রেডিট, কিসের আনন্দ সে বোঝে না। তার সেই পলিটিক্যাল জীবনটাও তেমনি উদ্দেশ্যহীন ও বিস্বাদ লেগেছিল। রাতারাতি পালিয়ে এসেছিল। তারপর ভিড়ে মিশে যাওয়ার মতো থেকে গেল। একেবারে নন-এ্যাকটিভ হয়ে ওঠায় তার কোনদিক থেকে বিপদ আসে নি।

—যাঃ! উড়ে গেল, বাবু! নিরাশ হয়ে মদন বলে। উঁকি মেরে আছে তখনও—দু হাঁটুতে হাত দিয়ে কুঁজো হয়ে আছে।

দিব্য বলে—চলো, অন্য কোথাও যাই।

মদন পা বাড়িয়ে বলে—বাঁওড়ের দিকে চলুন। ছুট্‌কোছাট্‌কা হাঁস থাকলেও থাকতে পারে।

—ছুট্‌কোছাট্‌কা মানে?

মদন কথা বলতে গেলেই দাঁড়ায়। এই ওর বিরক্তিকর অভ্যাস। সে বলে—কালী পূজোর পর থেকে হাঁস আসা শুরু হয়. বাবু। হর্দম শনশনানি মাথার ওপর। ধান পাকার পরও দু'একটা মাস থাকে। গাজন অব্দি দু'একটা ঝাঁক থেকে যায়। তারপর পালায়। শুনেছি পাহাড়ে পালায়।

—আঃ! কী যেন বললে ছুট্‌কোছাট্‌কা!

—সেই তো বলছি। কীভাবে এটা হয় কে জানে, দলছাড়া হয়ে থেকে যায় দুটো একটা। কিছুতেই যায় না। এত বড় আশ্চয্যির কাণ্ড বাবু। আমার মনে হয় কী জানেন? ওরা যেতে পারেনা আসলে। দলছাড়া হয়ে তখন দলকানা অবস্থা। কোনপথে যাবে, জানে তো সেই দলপতি। নাকি যাও যেতে পারত, ছাস্তির ভয়ে যেতে পারে না। তখন এদিকে জল শুকিয়ে কাদা হচ্ছে—মাটি জাগছে বিলের তলায়। জলচরা পাখি, অবস্থাটা বুঝুন বাবু। বেচারা এখন থেকে ওখানে ছটফটিয়ে বেড়াচ্ছে। কোথাও জল নেই। শেষে গাঁয়ের দীঘিতে গেল।

— তুমি দেখেছ এমন?

—কতবার দেখেছি। সবাই দেখেছে। তা শুনুন—সেবার দীঘিতে গিয়ে আশ্রয় নিলে বেচারা। যে দেখে, সেই মেরে খাবার মতলব আঁটে। কথাটা কানে গেল মোক্তারবাবুর। দীঘির পাড়ে গিয়ে হুকুম দিলেন, এ হাঁস যে মারবে তার মাথা নেব। ভয় করে সবাই ওনাকে। তারপর হাঁসটা থাকে। থেকে চরে-ফিরে খায় আঘাটায়। দামের মধ্যে ভেসে বেড়ায়। কী সুন্দর লাগে বাবু। বুনো জলহাঁস—কৈলাসে যার জন্মো, বাবা মহাদেবের দেশ। তখন গাঁয়ের অতিথ হয়েছে।....

দিব্য অবাক হয়ে তাকায় ওর দিকে। বলে—ঠিকই বলেছ, মদন। কৈলাস! মার কৈলাস!

—মোক্তারবাবুর কাছে শুনেছি আজ্ঞে।

—তুমি সেই হাঁসটার কথা বলো, মদন। শেষে কী হল?

—সেটাই আশ্চয্যি, বাবু। দীঘির জল বারোমাস থাকে। কিন্তু একদিন সকালে আর তাকে দেখা গেলনা। কেউ বলল পালিয়েছে কাছাকাছি কোন পুকুরে। যেসব পুকুরে জল ছিল, তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। মোক্তারবাবুর তখন জোয়ান বয়েস। এ-গাঁ ও-গাঁ

নিজেও খুঁজলেন—পঞ্চগ্রামী পর্যন্ত হল। সে কত লোক জমল বারোয়ারিতলায়।

—বল কী? একটা হাঁসের জন্যে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তখন গাঁয়ের মানুষ অন্যরকম ছিল, বাবু।

—হাঁসের কথা বলো, মদন।

দুঃখিত মুখে কয়েক মুহূর্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকার পর মদন বলে—আঃ!

—কী হল?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে লোকটা বলে—বলি, বাবু। হাঁসটা যেন সারা গাঁয়েব চোখের মণি হয়ে উঠেছিল। অন্যপাড়া থেকে ভাল পুকুর ফেলে সবাই দীঘিতে নাইতে আসত। কেন? না—হাঁসটা দেখবে। বিকেলবেলা ছেলেপুলেরা পাড়ে বসে-বসে দেখত। ঢিল ছুঁড়লে মেয়েরা তাড়া দিত। বউ-ঝিরা কেউ কেউ মানত দিত লুকিয়ে—হাঁসটার জন্যে। না জানি কোন দেবতা এসেছে। আর সে বছর বড সুলক্ষণ কপালীতলায়। ভাল ফসল হয়েছে। সুফলা বছর। বিবাদ কমেছে। লোকেব মুখে হাসি। বলুন, মানত দেবেনা? বউ-ঝিরা একগলা জলে দাঁড়িয়ে তাকে প্রণাম করত, বাবু।

—তারপর?

—হাঁসটা যেন অদেশ্য হয়ে গেল। আর পাত্তা মিলল না। পঞ্চগ্রামী করাই সার হল। কে মেরে খেল, জানা গেল না।

দিব্য চমকে উঠে বলে—মেরে খেল?

হ্যাঃ। মাঠে—ওইখানে ডানাপাখনা পাওয়া গিয়েছিল। রেতের বেলা লুকিয়ে মেরেছিল, বাবু। আর তার অভিশাপও লাগল। হ্যাঁ—দারুণ অভিশাপ। পরের সনে খরা। আকাল। সে আকাল বড় ভয়ঙ্কর হয়েছিল, বাবু। পঞ্চাশ সনের সেই আকালের কথা আর কী বলব।

—হ্যাঁ, তেরশো পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের কথা জানে দিব্য। তখন তার জন্মই হয়নি। সে জন্মেছে তার আরও পাঁচ বছর পরে। পঞ্চাশ লাখ লোক না খেয়ে মরেছিল। তবু কেড়ে খায়নি।....

তক্ষুনি নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলে—তোমার গল্পটা খুব ভাল লাগল মদন।

—এ গল্প বাবু, খুব দু:খের।

—তা তো বটেই।

আবার হাঁটতে থাকে সে। একটু পরে বলে—কিন্তু আমি জানি বাবু, কে হাঁস মেরেছিল।

—জানো? বলনি কেন?

মদন কেমন হাসে। ঘাড় নাড়ে। তারপর কল্কিফুলের ডালপালা একহাতে টেনে রাস্তা করে দেয় দিব্যকে। দিব্য বাঁধে ওঠে। তারপর মদন বলে—বললে মেয়েটাকে গাঁছাড়া করত। চুল কেটে নিত। গরীব লোকের বউ ছোটজাতের ঘরে জন্মো। কিন্তু রূপসী ছিল বটে। বাবুবাড়ির মেয়েরাও অমন হয় না। তিনটে স্বামীর ঘর পালিয়ে তখন বাবার ঘরে এসেছে। ওর বড় লোভ ছিল, বাবু—বিষম লোভ। মানে—ওই পদ্মর।

দিব্য হেসে বলে—পদ্ম নাম বুঝি?

মদন খিকখিক করে হাসে—কেমন রহস্যের আঁচ মুখে।

দিব্য বলে তোমার সঙ্গে ভাব ছিল না?

মদন লজ্জা পায় একটু, তারপর জোরে মাথা দোলায়।

—ভ্যাট্। তুমি চেষ্টাই করনি বলো!

মদন জিভ কেটে বলে—কী যে বলেন! এখন বুড়ো হয়েছি—চুল পেকেছে। মোক্তারবাবুর ঘরে জেবনটা কাটিয়ে দিলুম। সে পুরনো কথা বলতে গেলে নিজেরই হাসি পায়। আমি পদ্মকে ওই বাঁওরে একদিন একা পেয়ে বললুম—হাঁস খেয়েছ, জানি। পদ্ম হাতে-পায়ে

ধরতে লাগল। তারপরে....

—থামলে কেন? আমি বাইরের লোক। কাকেও বলতে যাচ্ছিনে।

—যা হবার হল, আজ্ঞে। বলে লোকটা ফ্যাক ফ্যাক করে হাসতে থাকে।

এই গরিলাটা রূপসী পদ্মকে ব্ল্যাকমেল করত। একটা বুনো হাঁসের জন্যে। ভাবা যায় না এত অদ্ভুত ব্যাপার। এই লোকটা ব্ল্যাকমেলার। এই লোকটাই একটু আগে সেই হাঁসটার জন্যেই কি দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল—দুঃখ করছিল? হয়তো না—সেই গ্রাম্য যৌবনটির জন্যে। সেই স্মৃতির নস্টালজিয়া, বিষণ্ণতা। একটা দলভ্রষ্ট বুনো হাঁসের সঙ্গে একটি যুবতীর রক্তমাংস ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে ওর স্মৃতিতে।

মদন ফের বলে—তবে আকালে পদ্মর দশা হল চূড়ান্ত। অভিশাপ, বাবু। বাপের সঙ্গে শহরে পালিয়ে গিয়েছিল। শুনেছি, কোলকাতায় হাড়কাটা না কি গলি আছে—সেখানে থাকত। এ্যাদ্দিনে আর বেঁচে থাকার কথা না। বিষ শরীলে নিয়ে মেয়েমানুষ বাঁচে না, বাবু।

—তুমি কি ওর জন্যই বিয়ে করো নি?

—আমি? হা হা করে হাসে উজ্জ্বল রোদে একটা আদিম মানুষ। মাথা দোলায়। তারপর হনহন করে হাঁটতে থাকে।

দিব্যের মাথায় উড়ে বেড়াচ্ছে একটা দলভ্রষ্ট বুনোহাঁস—তারপর ছলাৎ শব্দ কোন জনহীন দুর্গম জলায়, সেখানে নীল রঙের অদ্ভুত অন্ধকারে তার পাখনার শব্দ। হঠাৎ সে কেঁপে ওঠে। ভয় পেয়ে যায়। দলছাড়া হাঁসটা—প্রাণবন্ত, চঞ্চল গোঁয়ার, উদ্দেশ্যহীনতায় আক্রান্ত বুনো হাঁসের ভবিষ্যৎ কি সবারই সমান? কিছুতেই বাঁচানো যায় না তাকে?

হঠাৎ রূঢ় স্বরে সে বলে ওঠে—রোদে ঘোরাচ্ছ কেন? কোথায় তোমার হাঁস?

মদন ভ্যাবাচ্যাকা খায়। আস্তে বলে—আসুন তো দেখি। আপনার বরাত—ওরও বরাত।....

বেলা যত বাড়ছে, মধুমালা টের পাচ্ছে সেই চাঞ্চল্যটা বেড়ে যাচ্ছে। মনের এই ছটফটানিটা কেন সে একটুও বুঝতে পারে না। তখন বার বার সেই শেষ রাতের স্বপ্নটাকেই দায়ী করে। স্বপ্নটার ওপর রেগে যায়। তত লজ্জায় আড়ষ্টও হয়। অথচ সারাক্ষণ চঞ্চলতার মধ্যেও কী একটা চাপা সুর—অর্কেষ্ট্রার জাঁকালো স্বরের মধ্যে একটা নরম সূক্ষ্ম চিনচিনে কাঁপাকাঁপা সুর—সুখের। সেই সুরটা সবার থেকে আলাদা—আড়ালের। একলাএকলি সুখের এই বুঝি স্বাদ।

সে রান্নার আয়োজনে ভিড় বাড়াতে গেছে। কিছুক্ষণ পরে ভাল লাগে নি। মা বললেন, দাদার ওখানে যা। মাথাটাথা ধরছে দেখগে। ট্যাবলেট লাগবে নাকি। আর জগাই ডাক্তারকে খবর দিয়ে এসেছিল—তুই বরং একবার যাবে। এক ফাঁকে দেখে যাক্। এমন দিনে জ্বর। দেখে আয়, মালু।

দিনটা কিসের, মধুমালা বোঝে না। ভারি তো দুটো সঙের মূর্তি এসেছে কলকাতা থেকে—ধন্য করে দিয়েছে মোক্তারবাবুর বাড়িকে। মধুমালা ইতিমধ্যে বলতে ছাড়েনি—দুই জোকার! ওরাই আবার দাদার বন্ধু—ফ্রেণ্ডস। বুজুম ফ্রেণ্ডস্! হাসতে হাসতে এও বলছে—লরেলহার্ডি মা! একজন ঢ্যাঙা অন্যজন বেঁটে। লরেলহার্ডির ছবি তো দেখনি। হাসতে হাসতে মরে যাবে।

মন্দিরা বলেছেন—আঃ কী হচ্ছে! শুনবে যে!

—হুঁ, বয়ে গেল! একজন আবার বন্দুক নিয়ে বাঘ মারতে গেলেন। শেয়াল ডাকলেই ভিরমি খেয়ে না পড়েন। তখন দেখবে মদনচন্দ্র কাঁধে বয়ে নিয়ে আসছে। আমি তাই বলে ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছিনে বাবা!

এইসময় প্রমথ এসেছেন বাইরে থেকে।—কী রে খুকু? এত লেকচার দিচ্ছিস কিসের?

বাবাকে একটু সমীহ করে মধুমালা। জিভ কেটে সরে পড়েছে। নিজের ঘরে কিছুক্ষণ রেকর্ডপ্লেয়ার বাজিয়েছে। আওয়াজ চড়িয়ে দিয়েছে। কমিয়েছে, আবার চড়িয়েছে। তারপর পাঁচ মিনিট খাটে চিত হয়ে পড়েছে। দুহাতে ওপরে তুলে চোখ বুজে পা দুটো নাচিয়েছে। ভাল লাগছে না—কিছু ভাল লাগছে না। কোথায় যাই, কী করি, এইরকম ছটফটানি শুধু।

উঠে একটা পত্রিকা পড়তে চেষ্টা করেছে। পড়তে ভাল লাগে না। ছবি দেখছে। সিনেমাস্টারদের ছবি। তাও ভাল লাগল না। তখন আলমারি ভর্তি পুতুলের রাজ্যে দৃষ্টি ফেলল। ধুর! ওকি আর মানায় তাকে? এখন তাকে দেখলেই পুতুলগুলো ভয়ে যেন পাংশুটে হয়ে প্যাটপ্যাট করে তাকায়। আলমারি খুলে স্প্রীঙের বড় পুতুলটা বের করে সে। দম দিলে হাততালি দিয়ে কেমন নাচে সেটা। একবার নাচিয়েই তার গায়ে চড় মেরে ভরে দিল। আলমারি বন্ধ করে দেয়ালে দেয়ালে ঘুরে ছবি দেখে বেড়াল সে। তারপর বেরোল খিড়কি দিয়ে।

পূবের পাঁচিলে দরজা দিয়ে বেরোলে সানবাঁধানো পুকুর ঘাট। পাড়ে কলাবন। কলাবন হয়ে জ্যাঠামশায়ের বাড়ি। প্রমথবাবুর দাদা সাধনবাবু বহুকাল আগে পৃথগান্ন হয়েছেন। আগে দুই বাড়িতে যাতায়াত ভাবসাব ছিল না। ইদানীং খুব হয়েছে। সাধনবাবু বরাবর ব্যাচেলার ছিলেন। বছর খানেক আগে হঠাৎ বিয়ে করে

বসেছেন এক স্কুলমিসট্রেসকে। একটা ফুটফুটে বাচ্চা হয়েছে। মধুমালার ঠাকমা অবিবাহিত বড়ছেলের কাছে গিয়ে থাকার সময় মারা যান—তার পরে বিয়ে। সবাই বলে, মায়ের শেষ ইচ্ছে মেটাতেই সাধনবাবু বুড়ো বয়সে বিয়ে করলেন।

বুড়ো মানে খটখটে বুড়ো। তেমনি বদরাগী। তাঁর অকালে বিয়ে এবং বাচ্চা দেখে কপালীতলা থ হয়ে গেছে। মধুমালার জেঠিমারও চুলে সবে পাক ধরেছে। কেষ্টনগরের মেয়ে। স্কুল ছেড়ে স্বামীর ঘর করছেন এখন। ওঁর জন্যেই দুই ভায়ে দুবাড়িতে আবার ভাব। মধুমালাকে তো এসেই ন্যাওটা করে ফেলেছেন। এখন মজার ব্যাপার প্রমথ দাদার বাচ্চাটাকে নিয়ে সবসময় ঘোরেন। বাগানে নিয়ে এসে হাঁটা শেখান। এজন্য মন্দিরা যে আড়ালে একটু ফোঁস করেন, মধুমালা জানে এবং মুখ টিপে হাসে। একটু বোঝার বয়স তো তার হয়েছেই।

কিন্তু মন্দিরা আড়ালে যাই করুন, বড় জা'র সামনাসামনি অন্যরকম। তবে সুমিতা যতবার এবাড়ি আসেন, মন্দিরা ততবার ওবাড়ি যান না। জিনিসপত্র খাবারদাবার চালাচালি প্রায় সবদিনই। বড়জা ছোটকে, ছোট বড়কে টুকিটাকি সুস্বাদু রান্না একবাটি ঝি বা মেয়ের হাতে পাঠান।

মধুমালা আজ সকাল থেকে জেঠিমার কথা ভুলেই বসেছিল। হঠাৎ মনে পড়ে গিয়ে সে ছুটেছে। মা সত্যি বলেছিলেন—আজকের দিনটা। আজকের দিনটা যে কী, সব ভুলভাল হয়ে যাচ্ছে। ইস্, লক্ষিসোনা জেঠিমা, তাকেও ভুলে গিয়েছিল মধুমালা।

খিড়কিতে ওখানেও একটা ছোট্ট সানবাঁধানো ঘাট আছে। ক্ষান্ত ঝি ঘাটে হাঁড়ি মাজছিল। মধুমালাকে দেখে সে হাসে। —আজ যে দেখিনি বড়? শুনলুম কলকাতার কুটুম এসেছে। মাছ ধরছিল জাল ফেলে। যাও—জেঠিমা নাম করছিল! কারা এসেছে গো?

চণ্ড দেখে গা জ্বলে যায়। সবই জানে, সবই বলছে—অথচ ওর মুখ থেকে না শুনলে পেটের ভাত হজম হবে না। মধুমালা জবাব না দিয়ে ঢুকে পড়ে বাড়িতে।—জেঠিমা। জেঠিমা! এসে গেছি!

এবাড়িটা ছোট্ট। মোট দুটো ঘর, একটা টিনের রান্নাঘর—একতালা। কিন্তু ছিমছাম সাজানো। উঠোনেই ফুলবাগিচা। শিউলিতলায় টিউবেল। এক কোণায় স্নানঘর—ওপরে ছাদ নেই, তার পাশেই ল্যাট্রিন। এগুলো বিয়ের পর বানাতে হয়েছে সাধন-বাবুকে। পৈতৃক বাড়ির কোন ভাগ নেননি ছোটভায়ের কাছে। বরাবর গোঁয়ার ধরনের মানুষ। নিষ্কর্মা ও অলসও বটে। জমিজমার আয়ে চলে গেছে।....

আবার ডাকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় মধুমালা। বারান্দায় চেয়ারে বসে আছেন জেঠামশাই। খালি গা, পরনে লুঙি। বাবার মতো পৈতে রাখেন না। দেবদেবতা মানেন না। একে গম্ভীর রাশভারি মানুষ—এখন আরও গোমড়ামুখে বসে আছেন। পায়ের কাছে দুটো রুইমাছ। একটু আগে পুকুর থেকে ধরা হয়েছে, তার ভাগ।

সাধনবাবু মধুমালাকে যেন দেখতেই পাচ্ছেন না, মাছের দিকে চোখ। ঝগড়ার সুর লেগে আছে, এমন স্বরে বলেন—এক কথা হাজারদিন বলতে আমার ভাল লাগে না। কেন বলতে হবে? যা আমার পছন্দ নয়—যা নিষেধ করেছি, তাই। এ কী!

মধুমালা দেখে, দরজার পর্দা সরানো, ভেতরে খাটে জেঠিমাকে দেখা যাচ্ছে। পা ঝুলিয়ে ঝুঁকে বসে আছেন – বুকের তলায় টুম্পা। তার মাথায় মৃদু থাপ্পর দিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছেন এবং জেঠিমার চোখে জল। কাঁদছেন। খোঁপাভাঙা চুলগুলো ফ্যানের হাওয়ায় উড়ছে।

এ অবস্থাটা কোনদিন মধুমালা ভাবেও নি। জেঠামশাই জেঠিমার মধ্যে একটু আধটু ঝগড়া অনেক সময় না হয়েছে, এমন নয়। কিন্তু

মধুমালা এলেই ওঁরা তাকে ডেকেছেন—আয়! তারপর তক্ষুনি সব ঝগড়ার আবহাওয়া উবে গেছে। আবার স্বাভাবিক সব।

মধুমালা সতর্ক পা ফেলে বারান্দায় ওঠে। সাধনবাবু তবু যেন তাকে দেখতে পান না। বলেন—এমন জানলে....কক্ষনো....হুঁ:! এই শালা সংসার! লাথি মারো!

মধুমালাকে দেখে সুমিতা মুখ তোলেন। তারপর সোজা হয়ে বসে মুখটা ফিরিয়ে চোখ মোছেন আঁচলে। বলেন—কী রে? আসিন নি যে আজ?

মধুমালা ওঁর মুখের দিকে একটুখানি তাকিয়ে থাকার পর আস্তে বলে—এই তো এলুম।

বাইরে সাধনবাবুর কথা শোনা যায় আবার—না। দিস ইজ লাস্ট টাইম। তুমি মহাবিদূষী হতে পারো। বি. এ. বি. টি.—আমি শালা ননম্যাট্রিক। কিন্তু আমার সিক্সথ সেন্স আছে। আমি মানুষ—হিউম্যান বিইং।

সুমিতা চাপাগলায় বলেন—আঃ! তুমি থামবে? ছিঃ!

আর কোন কথা শোনা যায় না সাধনবাবুর। একটা অস্বস্তিকর স্তব্ধতা থাকে কিছুক্ষণ। মধুমালা সুমিতাব পাশে বসেছে। সুমিতা ওর চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে সস্নেহে ও আস্তে বলেন—খুব রোদ্দুরে ঘুরেছিস নাকি রে?

মধুমালা মাথা দোলায়।

—কে এসেছে তোদের বাড়ি?

—কে দুজন। দাদার বন্ধুটন্ধু।

—কলকাতার?

মধুমালা মাথা দোলায় ফের। তারপর একই অস্বস্তিকর স্তব্ধতা। টুম্পা ঘুমোচ্ছে। টুকটুকে লাল ঠোঁট কাঁপছে ঘুমের ঘোরে—ফুঁপিয়ে কান্নার মতো। কেন অমন হয়? আহা সোনা, মাণিক, টুম্পা!

স্বপ্ন দেখছ? কী স্বপ্ন গো? মধুমালা মনে মনে বলতে থাকে।.... আমার মতো স্বপ্ন? ও মা! তুমি তো ছেলে। তুমি বর হয়েছ? ছছুরবাড়ি যাচ্ছ? তবে কেন কান্না?

বাইরে আবার চাপা বিস্ফোরণ।—মাছগুলো চিলে নিয়ে যাক্। আমি বেরোচ্ছি।

ঘাড় ঘুরিয়ে বাইরেটা দেখে নিয়ে উঠে যান সুমিতা। ঝিকে ডেকে বলেন—ক্ষান্তদি, মাছদুটো নিয়ে যাও! তারপর ঘুরে বলেন—খুকু, আয়। মাছ কোটা দেখবি।

মধুমালা বেরিয়ে আসে।

রান্নাঘরের বারান্দায় সুমিতা বঁটি পেতে বসেন। ক্ষান্ত বলে—উঁ হুঁ হুঁ। সেদিনকার মতো হাত কেটে রক্তারক্তি করবেন দিদি। রাখুন, আমি কাটছি। যার যা কাজ! কোথায় ছাত্তর ঠ্যাঙাবেন, না বড়বাবুর বাড়ি....

এই অব্দি বলেই ঝি মেয়েটা পানখেকো দাঁতে হেসে ওঠে। সুমিতা ধমক দেন—থামো তো! সবসময় এক কথা ভাল লাগেনা। নিজে হাতে রান্না করে খেতুম না তো কটা দাসী-চাকরাণী ছিল আমার? এ বয়সে রাজরাণী হয়েছি—কি ভাগ্য। উনুনে আঁচ দাও। দশটা বাজতে চলল!

সুমিতার গোল মোটা হাতদুটো ঝাঁকুনি খায়, আর রক্তে লাল হতে থাকে. শাঁখা সরাতে গিয়ে রক্ত লাগে। মোটা কাঁকনজোড়া এঁটে বসে যায় মাংসে। গলার চেনটা বুকের মাংসে চিকচিক করে জ্বলে। ভরাট বুকদুটো গোলাপী ব্লাউজের মধ্যে দুলতে থাকে। হঠাৎ মনে পড়ে যায় মধুমালার। জেঠিমার পেটে যখন টুম্পা, মা হাসাহাসি করে বলেছিলেন—এ বয়সে পারবে ধকল সামলাতে? ভাসুর মশাই কলকাতায় নিয়ে যাক আগেভাগে। নার্সিংহোমে ভর্তি করে দিক।

কলকাতায় নিয়ে যাননি—ঘুঘুডাঙা হাসপাতালে কেবিন ভাড়া করেছিলেন জেঠামশাই। ব্যথা ওঠার দিন সে কী ছটফটানি ওঁর! সেদিনই বিশ্বকর্মাপুজো। ট্যাক্সি বাস সব বন্ধ। রিকশো করে নিয়ে যাওয়ার ভরসা পেলেন না। এ্যাম্বুলেন্স আনা হল অনেক বলেকয়ে। যতক্ষণ না এল, জেঠামশাই একবার রাস্তায় যাচ্ছেন—একবার বাড়ি ঢুকছেন। শেষ অব্দি প্রমথ বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন—দাদা একটা পাগল! ছেলেপুলে যেন কারও হয়নি—হচ্ছেনা। বাপস! গাঁ মাথায় করে ফেললেন একেবারে। যেন হাতি প্রসব হচ্ছে! যতঃসব! বাবার কথাটা এত কদর্য লেগেছিল সেদিন।....

—জেঠিমা! মধুমালা ডাকে।

—উঁ?

—জেঠামশাই কেন বকছিলেন?

—ও এমনি। তোমার জেঠামশাইয়ের মাথায় একরকম পোকা আছে, কামড়ায়।

—যাঃ। সত্যি, বলোনা জেঠিমা!

একটু চুপ করে থেকে হাসিমুখে কপট ধমকের সুরে সুমিতা বলেন—বড়দের ব্যাপারে ছোটদের নাক গলাতে নেই। একি অভ্যেস মেয়ের? আমরা না গুরুজন?

অমনি মধুমালা চলে আসে। উঠোনে হনহন করে হেঁটে যায়।

সুমিতা ব্যস্ত হয়ে ডাকেন—খুকু? শোন—শুনে যাও। কী অদ্ভুত মেয়ে তুমি। এই খুকু....

ততক্ষণে মধুমালা কলাবনে ঢুকেছে। আর তক্ষুনি ওর মাথায় একটা জ্বলন্ত সিগ্রেটের টুকরো পড়েছে। টের পেতনা, কিন্তু ওপরের কার্নিসে ঝুঁকে শান্ত বলেছে—এই যাঃ! মুখ তুলে তাকিয়ে মাথাটা ঝাড়ে সে। সর্বনাশ! চুল পুড়ে যেত। পুড়েছে কি না দেখার জন্যে মাথায় হাত দেয়। তারপর সিগ্রেটের টুকরোটা লাথি মেরে

নেভাতে চেষ্টা করে। ওপর থেকে শান্ত বলে—সরি, ভেরি সরি। দেখিনি।

মধুমালার মন তেঁতো-তেঁতো, একশো তেঁতো। একের পর একে এইসব ঘটে যাচ্ছে। রাগের চোটে সিগ্রেটটা সে গুঁড়ো করেও ক্ষান্ত হয় না, স্লিপারের ডগায় তুলে জলে ফেলে দেয় ধুলোমাটিসুদ্ধ। তারপর মুখ তুলে দেখে, তখনও শান্ত দাঁড়িয়ে আছে—দুহাত কার্নিশে রেখে নীচের দিকে ঝুঁকে আছে। মুখে কাঁচুমাচু ভাবের সঙ্গে একটা ধূর্ততা খেলা করছে। আর কৌতুকও।

সে সটান বাড়ি ঢুকে যায়। বারান্দায় পৌঁছে কানে আসে তাদের ঝি গেনুর মায়েব কথা: তা ভালই হবে। খুব ভাল হবে, গিন্নীদি। মোক্তারবাবু জ্ঞানী মানুষ। সব দেখে শুনেই তো এই বাক্যি বলেন—জ্ঞানের কথাই বলেন। মেয়েছেলের নেকাপড়া শিখে কি পাখনা গজাবে? ওই তো পাস-করা মেয়ে এনেছেন বড়বাবু (সম্মিলিত হাসি)....এবেলা গরম জলে পা পুড়ছে, ওবেলাতে হাত কেটে রক্তারক্তি হচ্ছে। মেয়েছেলে যখন, তখন স্বামীর ঘরসংসার করতেই হবে—করতেই হবে। একসময় করতেই হবে।....

মন্দিরা বলেন - আমার বাপু মত বদলেছে ইদানীং। উনি ঠিকই বলেন। শুধু আমার সুকুটা....তবে এবাব সুকুও মত দেবে মনে হচ্ছে। ছেলেটির কথা ক'দিন থেকে পইপই করে শুধোচ্ছি দেখে ও খানিকটা আঁচ করেছিল—বুঝলে গেনুর মা?

—এখন চোখেও সবাই দেখলেন। আমিও দেখলুম। খুব ভাল ছেলে। খুব ভাল।

—বাবার এক ছেলে তো। তিনটে—বুঝলে। তিনটে—মানে তিন তিনবার এম. এ. পাস। একটা এম. এ. পাস দিতেই তো সব অক্কা যায়। এ তল্লাটে কেন—সারা জেলাতে কজন আছে? উনি বলছিলেন—এ সুযোগ ছাড়লে চলবে না। উনি হয়তো কালই চিঠি

লিখবেন—নাকি নিজেই চলে যাবেন। চেনা-জানা লোক সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ধরবেন। বলছেন—যা চাইবেন ওনারা, রাজী হব।

—(চাপাস্বরে) হ্যাঁ গো, ছেলের মেয়েকে নিশ্চয় মনে ধরেছে ?

—হুঁউ। না ধরে পারে ? সে আমি টের পেয়েছি কখন। আর তোমরাই বলো, মেয়ে আমার পাঁচটার একটা। একটু ছেলেমানুষী এখনও আছে। তবে বিয়ের জল গায়ে পড়লেই ঠিক হয়ে যাবে। কত দেখলুম। আমিও তো এবাড়ি এসেছিলুম সেই এট্টুকুন বয়সে! তোমরা তো দেখেছ, বাপু! তার চেয়ে খুকু আমার কত বুদ্ধিমতী—স্কুল ফাইনাল....এই, এই! আবার ঢুকেছে! তাড়া-তাড়া! ঠাকুরঘরের বারান্দায় ওঠে না যেন, ঘরে আর এত গঙ্গাজল নেই আমার!

মারাত্মক ঘেঁউ আর্তনাদ শোনা যায়। তারপর কুকুরটা পালিয়েছে।

—হ্যাঁ গো গিন্নীদি, বললেন যে তিনটে বড় পাস। মেয়ে তো মোটে একটা—

একটু পরে মন্দিরা বলেন—হ্যাঁ। ঠিকই বলেছ গেনুর মা। কথা উঠবে। কিন্তু দেখ—আসলে টাকায় সংসার চলছে। আর জামাই যদি চায়, কলেজে পড়াবে। ইউনিভার্সিটিতেও পড়াবে। অসুবিধে তো নেই।....তা পড়াবে বইকি। আর মেয়ের অমন চেহারা—সেটাও তো ধরতে হবে, তোমরা বলো। এমন মেয়ে ক'টা কার ঘরে আছে, শুনি ? একশোটা পাস দিয়েও কি এমন মেলে ?

মধুমালা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছিল। পাথরের মূর্তি। মুখ লাল। নাকের ফুটো কাঁপছে। উরু অবশ—পায়ের পাতা কাঁপছে। ঠোঁট কামড়ে ধরেছে।

গেনুর মা দেখতে পেল হঠাৎ। চাপা গলায় বলে—মালু শুনছে।

মন্দিরা হাসেন। তারপর ডাকেন—খুকু! গিয়েছিলি জগাইদার ওখানে ? কী বলল ?

মধুমালা সবার সামনে এদিকের বারান্দা দিয়ে বসার ঘরে ঢোকে। বাবা আর কে সব বসে কথা বলছেন। সে হন হন করে বেরিয়ে যায়। সিঁড়ি বেয়ে নামে। গেটের দিকে চলতে থাকে উদ্দেশ্যহীন।...

নদীব ওপাবে বাঁধেব ওপর জামবনেব খানিকটা ছায়া এসে পড়েছে। একটু পরেই বাঁধ থেকে কপালীর জঙ্গলে ঢুকবে ছায়াটা। সেখানে বসে পড়েছে মদনবুড়ো। বাবা গো বাবা! কলকাতার মানুষটা যে চাষাভূষোব চেয়ে দড়। এতটুকু ক্লান্তি নেই, গ্রাহ্য নেই — বুনো শুওবেব মত গোঁ ধবে বনবাদাড় বিলখাল চষে বেড়াচ্ছে। আর কী বন্দুকবাজ, কী টিপ হাতের! যা টিপ করে, তাই পড়ে। মদন হাঁপাতে হাঁপাতে আপনমনে হাসে। তার হাতে একজোড়া ঘুঘু, একটা জলপিঁপি, একটা তিতির। এবেলা জাল ফেলে পুকুরের মাছ ধরিয়েছেন মোক্তাববাবু। ওবেলা পাখির মাংস হবে। ছোটবাবু সুকুর সঙ্গে অনেকবার এসেছে মদন। সে এব কাছে নাবালক। সাক্ষাৎ অর্জুন। সব্যসাচী। দুহাতেই সমান টিপ। ধন্যি যাই বাবা, গড় করি।... ...

দিব্য সিগ্রেট ধরিয়ে টানছিল, দাঁড়িযে। সুকুমারের পাজামা-পাঞ্জাবিতে কাদা লেগেছে। চোরকাঁটা ফুটেছে! দেখে নেবে ওরা। ওপারে উত্তর-পশ্চিমে কপালীতলা দেখা যাচ্ছে। সুকুমারদের দোতলা বাড়িটা খুঁজছিল সে। অন্যমনস্কভাবে বলে—এই নদীর কোন গল্প নেই মদন?

মদন মাথা নাড়ে।—কপালীর? আছে। অনেক আছে।

—কিন্তু তুমি হাঁফাচ্ছ?

—ভেষ্টা পেয়েছে, বাবু। আপনার পায়নি?

—না। বলে সে চুপ করে যায়। বেশ খানিকটা দূরে ঘাট। এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি ওখানটা। সুকুর বোন না? নদীর খাত থেকে সবে এপারে উঠছে। চুল উড়ছে, কাপড় জড়িয়ে যাচ্ছে গায়ে ও পায়ে। বার বার সামলে নিচ্ছে। অমনি বুকের মধ্যে গুর গুর করে ড্রাম বেজে ওঠে দিব্যের। চোখের সামনে বিশাল প্রকৃতি কয়েকমুহূর্ত তীব্র হয়ে জ্বলে ওঠে। তারপর মাথার খুলির ভিতর বাতাস ঢুকে যায় একঝলক। কান ভোঁ ভোঁ করতে থাকে। তবে কি....ঠোঁট কামড়ে ধরে দিব্য।

আমার মনে হয়, তা যদি হয়—তাহলে কেন ও আসবে? চাকর-বাকর কাকেও পাঠাবে সুকুমার।....

অবশ্য এমনও হতে পারে, সুকুমারের বোন নিজেই উদ্যোগী হয়ে খবর দিতে আসছে।...

কিন্তু এত শিগগির!....

অবশ্য কলকাতা তিনঘণ্টার পথ মাত্র। তাছাড়া রেডিও মেসেজ বলে একটা ব্যবস্থা আছে। রাষ্ট্রের প্রশাসন আজকাল মডার্ন টেকনিকে সাজানো। রাষ্ট্র কী ভয়ঙ্কর শক্তিমান হতে পারে, ঈশ্বরের চেয়ে মারাত্মক—প্লেটোর কর্তাবাবাও কল্পনা করেননি।....

গুর গুর গুর ড্রাম বাজতে থাকে। নাকি রেলব্রীজ পেরোচ্ছে কোন রেলগাড়ি—নাকি বুকের মধ্যে এই গুরুতর আওয়াজ। বন্দুকের নলটা শক্ত করে ধরে দিব্য বলে—মদন!

—বলুন বাবু!

—তুমি....তুমি বরং চলে যাও। আমি এখনও ঘুরব।

—সে কি বাবু! চানের সময় হয়ে এল। ক্ষিদে পায়নি?

—না। তুমি যাও।

মদন মুখের দিকে তাকিয়ে চমকায়। রোদে-বাতাসে কলকাতার বাবুর মুখ পোড়েনি, হঠাৎ এতক্ষণে গনগনে লাল। কখন ধরে

ফেলেছে, এ এক ক্ষ্যাপাবাবু—এবার আরও ক্ষ্যাপা। অনেক বন্দুকবাজ বাবুর সঙ্গে মোক্তারমশাই তাকে পাঠিয়েছেন কপালীর জঙ্গলে, এমন দেখেনি সে। ইনি কে বটে গো?

সে নদীর ঢালু পাড় বেয়ে সাবধানে নামতে থাকে। খাতের বালিতে পা পুড়ে যায়। তখন দৌড়ে জলে নামে। একহাতে পাখি, অন্যহাতে জল খায় শরীর ঝুঁকিয়ে। আঃ, বলে উঠে দাঁড়ায়। বাঁধের দিকে উঁচুতে তাকায়। কলকাতার বাবু দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ বড় মায়া হয়, কেন কে জানে। কী যেন চাপা দুঃখ আছে ছেলেটার বুকে, তাই সারাক্ষণ আনমনা—কেমন যেন উদাস-উদাস দৃষ্টি, কপালে তিনটে ভাঁজ! দূরের দিকে তাকিয়ে কী ভাবছে, আর ভাবছেই। এমন কাঁচা বয়সে কোথায় ঘুণ ধরেছে গো?

কিন্তু তাই বলে পাখিদের ছাড়ান নেই। দেখলেই বাঘের মত চোখে খুনের নেশা জ্বল জ্বল করে ওঠে। মদন সামনে ঝুঁকে গরম বালির চড়া লাফাতে লাফাতে পার হতে থাকে। ..

দিব্য কল্কিফুলের ঝোপ ঠেলে এগিয়ে দাঁড়ায়। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

সুকুমারের বোন কপালীর মন্দিরের সামনের পরিষ্কার মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আছে, পিঠটা ফুলে ফুলে উঠছে। দীর্ঘ দু-তিনটে মিনিট ওই ভাবে থাকার পর সে মুখ তোলে। গাল ভেসে যাচ্ছে জলে। কপালে ধুলো। ঠোঁট কাঁপছে। দৃষ্টি মন্দিরের ভেতরদিকে—যেখানে ধ্বংসের শূন্যতায় আগাছা।

কেন? সাবধানে নিঃশব্দে দু'পা এগোয় দিব্য। কেন সুকুর বোন অমন করছে?

আর হঠাৎ একটা মিরাকল ঘটে যাওয়ার মত কোত্থেকে একটা

সাদা প্রজাপতি নাচতে নাচতে এসে সুকুমারের বোনের গালের পাশ দিয়ে যেতেই সে খপ্ করে ধরে ফেলে। মুহূর্তে মুখটা হিংস্রতায় ভরে যায়। তার ওপর কান্নার ছাপ। সুন্দর মুখে এ কি রাগ না ঘৃণা, ঘৃণা না হিংসা, হিংসা না দুঃখ—সব মিলেমিশে গেছে। প্রজাপতিটা পিষে মেরে হাতের মুঠো খোলে সে। হাতের তালু ও আঙুল সাদা হয়ে সবুজ গুঁড়োগুঁড়ো পাউডারের মত প্রজাপতির মাংসে ভরে গেছে। হাতটা ঝেড়ে ফেলতে গিয়ে মুখ ঘোরায় এবং দিব্যের সঙ্গে চোখাচোখি। এবং সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়।

দিব্য এগিয়ে গিয়ে বলে—কী ব্যাপার?

ঘুরে দাঁড়িয়ে জোরে মাথা দোলায় মধুমালা।

দিব্য পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে ফের বলে—এসব কী? কেন?

দীর্ঘ একমিনিট অপেক্ষা করে জবাব শোনার জন্য। ততক্ষণে সেই মারাত্মক ড্রামের বাজনা থেমে গেছে। ভেতরের স্তব্ধতাটা ক্রমশ ভরে তুলেছে কপালী জঙ্গলের নৈসর্গিক আওয়াজগুলো। পাখি ও পোকামাকড়ের ডাক। বাতাসের শব্দ গাছপালায়, শুকনো পাতার শব্দ, এই সব। তারপর হঠাৎ আবার আসে আরেকটা সাদা প্রজাপতি – হয়তো আগেরটার জোড়া, এবং ধরার জন্য হাত বাড়ায় মধুমালা, কিন্তু হাত ফসকে গিয়ে দিব্যের বুকে এসে লাগে। দিব্যের বুকের দিকে হাতটা আর এগোয় না দিব্য নিজের বুকের দিকে তাকিয়ে একবার শিউরে উঠেছিল—রোমাঞ্চ যাকে বলে এবং পরক্ষণেই ব্যাপারটা কুসংস্কার বলে সে উড়িয়ে দিতে হো হো করে হাসে।—তুমি এসব বিশ্বাস করো? সব বাজে - গাঁজাখুরি। কোন মানে হয় না! –

॥ চার ॥

প্রজাপতিটা নিয়ে কথা না বললেও পারত দিব্য। কতসব পোকামাকড় দিনরাত মানুষের গা ঘেঁষে ঘোরাফেরা করে বেড়ায়। এসব আলোচনা বা উল্লেখের বিষয় নয়. যুক্তিসিদ্ধও নয়। কিন্তু মানুষ সব সময় তার পুরনো সংস্কার নিয়েই ব্যস্ত। এও একরকমের কুসংস্কার। এবং তা দিয়ে মধুমালাকে যেন অনেকটা নোংরা করে ফেলা হল।

পরে এসব কথা আলগোছে মনের একধারে ভেবে নিয়েছে দিব্য। বেচারী মধুমালা কুমারী মেয়ের লজ্জার আড়ালে চলে গিয়েছিল কিছুক্ষণ। এও অবশ্য তার পুরনো সংস্কার। তাই দিব্যের ওপরও যেন পাল্টা নোংরা ছড়ানো হল! কিছুক্ষণ দুপক্ষেই অস্বস্তি।

সাদা প্রজাপতিটা আঙুলে ঠেলে সরিয়ে দিলে সেটা উড়ে গেছে বন তোলপাড় করতে। দিব্য ফের বলে—ব্যাপার কী তোমার? বাড়িতে বকাবকি?

জবাব না পেয়ে আবার বলতে হয় তাকে—তোমরা এখানে বেশ আছ, দেখছি। দুঃখুটুঃখু পেলে একলা লুকিয়ে মাথা ঠোকবার জায়গা আছে। আমি থাকি অন্যরকম জায়গায়। কান্নাকাটির কথা ভাবাই যায় না। হাসি পায়! পাঁচ সাতশো বছর আগে মানুষ চোখে কাঁদত, এখন কাঁদে ব্রেনে।

মধুমালা সোজা তাকায় একবার। অনেকটা সামলে নিয়েছে। তারপর আস্তে বলে—চলি।

—আমি কোথায় যাব?

—যেখানে এসেছেন।....বলেই সে ঘুরে পা বাড়ায়। ফের বলে—শ্রাদ্ধ খেতে।

দিব্য হাসতে চেষ্টা করে।—বাড়িতে কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়। তুমি রাগ নিয়ে এসেছ। কারো ওপর পাল্টা শোধ চাইছ—মানে, এতক্ষণ কান্নাকাটি করে তাই দাবি করছিলে? দেখছ না, মন্দিরটা খালি পড়ে আছে? কে শুনবে তোমার কথা?

—থাক। আপনাকে দিব্যি দিইনি।

—কিসের?

—অ্যাডভাইস দেবার।

—তুমি খুব বাঙালী-বাঙালী করছিলে। অ্যাডভাইস বলছ।

—স্লিপ অফ টাং!

দিব্য জোরে হাসতে থাকে।—আবার! আবার!

মধুমালা অমনি ফিক করে হেসে ওঠে—যদিও রাগে জ্বলে উঠেছিল এক সেকেণ্ডের জন্যে। তারপর 'অভ্যেস' বলে ফের পা বাড়ায়। কিন্তু তখন হাসিটা ক্ষয়ে যেতে যেতে শেষ।

দিব্য দারুণ হঠকারিতায় খপ্ করে ডান হাতে ওর বাঁ হাতটা ধরে ফেলে এবং বাঁ হাতে বন্দুকের নল আছে। দিব্যের গলার স্বরও হঠাৎ বদলে যায়।—শোন, কথা আছে।

মুখ নামিয়ে মধুমালা পায়ের তলার মাটি দেখতে দেখতে প্রায় হাঁফানির মতো অস্পষ্ট বলে—ছাড়ুন।

—না। কথা আছে।

মধুমালা মুখ নামিয়ে রেখেই মাথাটা জোরে দোলায়। খোলা চুলগুলো দুকাঁধে ছুটোছুটি করে। তারপর হাতটা টানতে গিয়ে বুকঅব্দি তোলে এবং টের পায়, পারবে না। এই লোকটা তার কামিনী গাছটাকে অপবিত্র করেছিল! কার্নিশের ওপর উঁচুতে একে দাঁড়ানো দেখে সেই পাপ ক্ষমা করেছিল মধুমালা। কিন্তু সেটা ভুল—

চোখের ভুল। মধুমালা ঘামতে থাকে। তার কুমারী শরীর থরথর করে কাঁপে। মুখের লালচে ছটা আস্তে আস্তে ফিকে হতে হতে ছাইপড়া দেখায়।

দিব্য কাঁপুনি ও পাংশুতা লক্ষ্য করে বলে—কী বলব ভাবছ তুমি? সে ধমক দিয়েই বলে একথা।—আমি ওই বেঁটে ভূতটা নই! আমার বাবার হোসিয়ারি ছিল না।

—হুঁ, আপনি সাধুসন্নাসী! হাত ছাড়ুন!

—বলছি, কথা আছে। চলো, ওখানটায় গিয়ে বলব। জরুরী কথা।

—বন্ধুর বোনকে একলা পেয়ে—

—কী একলা পেয়ে? তুমি ভারি অভদ্র মেয়ে তো!

মধুমালা মুখ তোলে দ্রুত। সোজা তাকায়। কিছু কণ্ঠস্বর আছে, মেয়েরা টের পায়। দিব্যের সেই শূন্যতাময় বড় বড় চোখে আগুন জ্বলছে। কেমন বশ মেনে যায় সে। বলে—চলুন।

হাত ছেড়ে দিয়ে দিব্য পা বাড়ায়। ওপাশে একটা কুঁচফলের ছড়ানো ঝোপ ফুঁড়ে একটা ছাতিম উঠেছে। তার ছায়া উত্তরে নেমেছে খানিকটা শুকনো ঘাঁসে। জায়গাটা ভাল লাগছিল বসতে। সেখানে গিয়ে দিব্য বলে—বসো। তারপর নিজেও বসে।

মধুমালা একটু তফাতে বসে। দু'হাঁটু উঁচু করে তার ফাঁক দিয়ে হাত চালিয়ে পায়ের কাছে ঘাস ছেঁড়ে। আঙুল আড়ষ্ট। শক্তিহারানো বা রুগ্ন মানুষের ছাপ পড়েছে তার মধ্যে। অথচ ভিতরে তোলপাড়। কপালী নদীর একবর্ষার জল কল কল করে বয়ে যাচ্ছে, পাড় ধ্বসার শব্দ ওঠে দু'একবার। একটা ভয় ঘুরেঘুরে ওড়া চিলের মত ছায়া ফেলে বেড়ায় কোথাও। জঙ্গল জুড়ে পোকা-মাকড়ের নানারকম শব্দ। সেইসব শব্দ আঁকড়ে ধরে সে। মিশে যেতে পারত যদি এই জঙ্গলের গোলমালে।

দিব্য একটা সিগ্রেট ধরায়। কিছুক্ষণ চুপচাপ টানে এবং ধোঁয়ার আংটি বানিয়ে দেখে। তারপর আস্তে বলে—আমি এখানে কেন এসেছি, জানো?....মধুমালা মাথা একটু দোলাল দেখে সে ফের বলে—

—তুমি জানো না।...তিরিশ সেকেণ্ড পরে আবার—শান্তও জানে না। পনেরো সেকেণ্ড পরে সুকুও না।...এবং এইসময় একটা ঘূর্ণিহাওয়া জঙ্গল নাড়া দিতে দিতে ওদের পেরিয়ে যায়। খড়কুটো শুকনো পাতায় ডুবে যায় দু'জনে। চুল, কাপড়চোপড় ওড়ে।

তখন এগারোটা। রোদ ফেটে পড়ছে। আকাশ তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে চিল। জগাই ডাক্তার এসে যাবেন, খবর পাঠিয়েছেন। এখনও সত্তর জনের লাইন আছে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। কিছু ফুলকো লুচি খেতে হয়েছে শান্তকে। আবার আমের ফালি প্লেটে। দুপুরে খেতে দেরী হবে। জল খেয়ে সে সিগ্রেটের প্যাকেট খোলে। হতাশ হয়ে বলে—ধুস্।

সুকুমার বলে—আনাচ্ছি। জগা!

জগা সিঁড়ির মুখ থেকে সাড়া দেয়—আছি ছোটবাবু।

শান্ত উঠে দাঁড়ায়।—থাম্, দিব্যের ঝোলা হাতড়াই। শেয়ালদায় পাঁচ প্যাকেট কিনেছিল। নিশ্চয় শেষ হয়নি। শালা যা টানে—চেইন স্মোকার। এ্যাদ্দিন ক্যান্সার হওয়া উচিত ছিল। ডেফিনিটলি হবে!

বলতে বলতে সে ওয়াড্রোবের কোনায় ঝোলানো দিব্যের লাল ঝোলাটা নামায়। —ব্যাটা লালের ভক্ত বড্ড। সুপার এক্সপ্লোসিভ কারবার। ওকে মাইরি আজও বুঝতে পারিনে সুকু।

সুকুমার মিটিমিটি হেসে বলে—আমিও বুঝিনি! মিস্টিরিয়াস ক্যারেকটার।

শান্ত সোফায় বসে কোলে ঝোলাটা রেখে বলে—এত কী মালপত্তর এনেছে রে! ভারি লাগল। মাই গুডনেস!....শান্ত খিক খিক করে হাসে। বইটা বের করে দেখে সে।...জিনিয়াস্। আঁতের কারবার মাইরি সুকু।

—আঁতে? সুকুমার প্রশ্ন করে।

—তাও জানিসনে? গাঁয়ে এসে তুই গেছিস্! ইনটেলেকচুয়াল—ফরাসী কায়দায় আঁতেলেকচুয়্যাল।

- তাই বল্। সিগ্রেট পেলি?

—দেখছি। কিন্তু এসময় ব্যাটা এসে পড়লে কেলেঙ্কারি করবে! ....ইস্। ডায়েরি। সুকু, সুকু! ডায়েরি লেখে। ভাবা যায় না।.... তারপর একটা সিগ্রেটের প্যাকেট বের করে শান্ত বলে—পেয়ে গেছি। এসে খচে যাবে। যাক্, এখন খেয়ে তো নিই।

সিগ্রেটের প্যাকেটটা টেবিলে রেখেও সে ক্ষান্ত হয় না। ঝোলা হাতড়ায়। মুখে দুষ্টুমির হাসি।—নিশ্চয় আরও বিশেষ কিছু আছে। বুঝলি সুকু? গতকাল সন্ধ্যায় গিয়ে হঠাৎ বলল, তুই সুকুর ওখানে যাচ্ছিস কবে? যাবি বলছিলি যে? বললুম—টুমরো মর্নিং। ও বলল—আমিও যাব। এ্যাক্সেপ্টেড। তারপর ও বলল, সঙ্গে মাল ফাল নিস।

—নিয়েছিস?

—হুঁ। মনে হচ্ছে দিব্যও এনেছে। প্যাকেটে মোড়া এটা নির্ঘাৎ জিন। ব্যাটা জিনের ভক্ত। সুকু, তোর ঘরে রাত্তিরে অসুবিধে নেই তো?

সুকুমার চাপা গলায় বলল—না। আগেও হয়েছে কতবার। সুজনরা এসে খেয়ে গেছে। তবে ভাই, হুল্লোড় চলবে না। বুঝতেই পারছিস, বনেদী ফ্যামিলির কারবার।

—পাগল! শুধু ওটাকে সামলাস্। বলে প্যাকেটটা বের করে

শান্ত। হা হা করে হাসে।—আগে এটা শেষ হবে। তুইও খাবি। জ্বর ছেড়ে যাবে।

সুকুমার বলে—খুলে দেখ না, কী জিনিস?

প্যাকেটটা সুতোয় আষ্টেপিষ্টে জড়ানো। দ্রুত সাবধানে খুলতে থাকে শান্ত। খবরের কাগজ, তার তলায় ইঞ্জেকসান এ্যামপিউলের কাগুজে বাক্স—আন্দাজ চার বাই সাত ইঞ্চি। রবারের আংটা পরানো। খুলতে খুলতে শান্ত সন্দেহের সুরে বলে—স্মাগলিং কারবার নয় তো? ওকে কিচ্ছু বিশ্বাস নেই কিন্তু। ভেরি ডেঞ্জারাস চ্যাপ।

তারপর বিকট ভঙ্গীতে শিউরে ওঠে সে। চোখ কপালে তুলে ফিস ফিস করে বলে—সুকু! সুকু! সর্বনাশ!

সুকুমার খাট থেকে আধখানা উঠে বসেছে তক্ষুনি। বলে—কী রে ওটা?

—রিভলবার। একগুচ্ছের কার্টিজ। সুকু। দিব্য এখনও ডেঞ্জারাস রে!

—রেখে দে শিগগির। এক্ষুনি কেউ এসে পড়বে।

শান্ত কাঁপতে কাঁপতে মোড়কটা গোছাতে থাকে। ওর মুখে নার্ভাস মানুষের ছাপ স্পষ্ট। জোরে শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলে। সুতো মোটামুটি জড়ানো হয়ে গেলে সে সিগ্রেটের প্যাকেটটাও ভীতু মুখে ঝোলায় ঢুকিয়ে দেয়। ঝোলাটা আগের মত রেখে আসে। ঘরে অস্বস্তি ঘুরছে। হঠাৎ একটা গুরুতর রকমের স্তব্ধতা ঢুকে পড়েছে, সেটা যেন সিংহের মত বসে আছে পিছনের হাঁটু দুমড়ে। জিব চাটছে। সুকুমার চিত হয়ে শুয়ে চোখ বোজে। চাদরের মধ্যে পা দোলায়। তারপর বলে—ওকে বন্দুক দেওয়া ঠিক হয়নি। জানতুম না তো।

শান্ত ভারি গলায় বলে—তোদের চাকরটাকে ডাক, সুকু। সিগ্রেট আনাই।

—জগা।

—আছি গো, আছি। পালাই নি।

সুকুমার রেগে যায়।—ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছিস কেন? দেব এক চাঁটি মাথায়। এখানে আয়!

জগা এলে সে বালিশের তলায় হাত ঢোকায়। শান্ত দেখেও কিছু বলে না। এর কারণ, হয় সে এবাড়ির অতিথি, অতএব আতিথ্য পুরোমাত্রায় উশুল করতে চায়—নয় তো, দিব্যর রিভলভারের অলীক গুলি খেয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

জগা চলে যাবার পরও কিছুক্ষণ দুজন চুপচাপ থাকে। তারপর শান্ত আস্তে আস্তে বলে—আমারই ভুল হয়েছিল। তোর এখানে আসব বলে তোকে চিঠি লিখেছি, কেন যে ওকে বলতে গেলুম! সুজনকে বললে ভাল করতুম। সুজন আসত। জানিস? বাইরে কোথাও একা বেড়াতে যেতে ভাল লাগে না, তাই।

—দিব্য সঙ্গে ওটা কেন আনল, তোর কী ধারণা?

—মনে হচ্ছে পার্সোনাল সেফটির জন্যে।

—তাহলে লোডেড রাখত। খোলা রাখত পকেটে। অমন মোড়কে কেন?

শান্ত মাথা দোলায়। —ঠিক, ঠিক। ওর কিন্তু শক্রুটক্রু থাকা উচিত—স্বাভাবিক সুকু।

—হুঁ। কিন্তু....

—ছেড়ে দে। বরং এক কাজ করি সুকু। আমি আজ বিকেলেই ফিরে যাই। তাহলে কোনমুখে ও একা থাকতে চাইবে? তারপর আমি আবার আসব। আমার খুব ভাল লেগেছে এখানটা। তোদের ফ্যামিলি বা বাড়িটাও চমৎকার। কী ভাল যে লাগছিল এতক্ষণ! গ্যাংস্টার সব বরবাদ করে দিল। বরাবর—এভরিহোয়ার ওর কারবার

এইরকম। কুকুরের মত অবলীলাক্রমে ঠ্যাং তুলে পেচ্ছাপ করে দেয়। আর কক্ষনো ওর সঙ্গে নয়—নেভার।

সুকুমার চুপ করে থাকে। কয়েকবার কাশে শুধু।

—হ্যাঁ, আজ চলে যাই। বরং শিগগির ফের আসব। একা আসব।

—কিন্তু মা কি যেতে দেবেন? রাগ করবেন। বাবাও····

—খুলে বলতে দোষ কী? এ্যাঁ? বলে দে সব।

সুকুমার একটু ভাবে। তারপর কেমন পাংশু হাসে।—সেকথা পরে। কিন্তু দিব্য যদি বলে—থাকব? যদি যেতে না চায়? ওর হাবভাবে মনে হল, কদিন থাকতে চায়। দেখলি না? বন্দুক নিয়ে কেমন নাচতে-নাচতে বেরিয়ে গেল। ওর শিকারের নেশা আছে, একটু আধটু জানতুম। কিন্তু সত্যি বলে বিশ্বাস করিনি। তোর মুখেই আজ শুনলুম—ও রাইফেল ক্লাবের মেম্বার। হ্যাঁ রে, তাহলে তো ওর রাইফেল অবশ্যই আছে। দেখিসনি?

—না। ব্যাটা ববাবর গুলবাজ। নিজেই বলে রাইফেল ক্লাবের মেম্বার। আমার সঙ্গে ইউনিভার্সিটি ছাড়ার পর যোগাযোগ তো কদাচিৎ। সেও বারে বা কফিহাউসে। মুখটা দেখিস না—যেন সব-সময় ভেতরে কী ঘোঁট পাকাচ্ছে।

সুকুমার হাসবার চেষ্টা করে বলে—তাহলে বোঝা যাচ্ছে, এমন একজনের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব—যার সম্পর্কে খুব কম কথাই আমরা জানি। স্ট্রেঞ্জ! কিন্তু বল্ শান্ত, ওর একটা এ্যাট্রাকটিভ পার্সোনালিটি আছে। ওটাই ওর জোর। তোর কী মনে হয়?

—হাতি না ঘোড়া! মাস্তান ইজ মাস্তান!

—ও কি সত্যিসত্যি ব্যাংকে চাকরি করে? গেছিস কখনও ওর ব্যাংকে?

শান্ত জোরে মাথা দোলায়।—স্রেফ গুল হয়তো। ওর কলেজ

লাইফে যা স্পট আছে—তখন বললুম না তোকে? কিভাবে ম্যানেজ করল—সেটাই তো অবাক লাগে বরাবর। সুকু, এখন আমার বিশ্বাস—ইউনিভার্সিটি ছাড়ার পর থেকে এই ক'বছরের মধ্যে আবার কিছু ঘটেছে ওর লাইফে। আই অ্যাম ডেড সিওর এখন। ওসব ব্যাংকের চাকরি ফাকরি সব ধাপ্পা।

—কিন্তু ওর সোর্স অফ ইনকাম কী? কেমন চুকচুকে হয়ে রয়েছে। পয়সাকড়ি না থাকলে এটা সম্ভব নয়।

শান্ত উদ্বিগ্ন মুখে বলে—ভ্যাট্! সব আনন্দ মাঠে মেরে দিলে! আমার কিছু ভালো লাগছে না। সে উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি শুরু করে। কয়েক পা চলাফেরার পর থেমে বলে—আমি আজ যাই। আবার আসব। পরশু আসব। তুই বাড়িতে একটু ম্যানেজ কর সুকু।

সুকুমার আবার মিটিমিটি হাসে।—করলুম। কিন্তু দিব্য যদি থাকতে চায়?

—ওঃ। ওই প্রবলেম।.....

নীচে তখন রান্নাঘর আর বারান্দা জুড়ে আয়োজন। যেন একশো লোক খাবে, এমন ছড়ানো-ছিটানো জিনিসপত্র, আনাজপাতি। মন্দিরা মোড়ায় বসে নির্দেশ দিচ্ছেন। হাতে তালপাখা। একদণ্ড ঘরে ফ্যানের হাওয়া খেয়ে আসার ফুরসৎ নেই। এরা বড্ড চোর। মন্দিরা খুব ঘামছেন। ধমক দিচ্ছেন। কখনও হাসছেন। ভাবী কুটুম্বিতে নিয়ে রসিকতাও চলছে—তার টুকটাক জবাব দিচ্ছেন। কখনও বলছেন—ওরে, তোরা গাছে কাঁটাল গোঁফে তেল করিস নে তো আর। থাম! খুব হয়েছে। ভাগ্যে থাকলে সব হবে। গেনু! হুলোটা এসেছে—ওই ছাখ! তাড়া!

এই সময় তুলেপাড়ার বউটা এল। ঝুড়িতে কলমীশাক আর ডুমুর এনেছে। গেনুর মা বলে—ওই! এসে গেছে। তোমার আর দিন ছিল না গো?

মন্দিরা আইটেম বাড়াতে বাড়াতে অনেকটা এগিয়েছেন। শাক দেখে খুশি হয়ে বলেন—বিমলি, শাকটা নে। শিগগির বেছে ফেল্।

বিমলা আজ ঠিকে ঝি। সে সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তুলে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলে—দিব্যি করে বল তো বাছা, বাঁওরের শাক নাকি?

দ্রুত জিভ কেটে দেবদেবতা ও নিজের কাচ্চাবাচ্চার কিরে করতে থাকে শাকতোলানী মেয়েটি।—না, না। চোখের কিরে, দিদি। দীঘিতে তুললুম। কত লোক দেখেছে।

বাঁওরে ছোটলোকের আ-পোড়া মড়া গিয়ে আটকে থাকে। অথচ সেখানেই কলমীদামের ঘন জঙ্গল। বড় বড় পাতা, তেজী সবুজ রং, বেগুনি রেখা বসানো সাদা ফুলে ছয়লাপ। পানকৌড়ি ওড়ে। জলপিঁপরা ডিম পাড়ে। একঠ্যাঙে বক ওৎ পেতে দাঁড়ায়।....

মন্দিরা বলেন—বাছতে গেলে তো কিছুই মুখে তোলা যায় না। ও কী? ডুমুর এনেছ? ঠাকুর! আজ চতুর্দশী না? ডুমুর খায় আজ?

চারু ঠাকুর খুন্তি হাতে রান্নাঘরের দরজা থেকে উঁকি মেরে বিরক্ত মুখে বলে—হুঁঃ! সব খায়।

বিমলা হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে—হ্যাঁ গা ভালমানুষের মেয়ে। শাক যদি দীঘির হয়, দীঘির পাড়ে তোমার কত্তাবাবা কি ডুমুরও লাগিয়ে রেখেছে?

মন্দিরা ধমক দেন—আঃ! লোক আছে বাড়িতে। গলা করিস নে তো বাপু।

তুলেবউ কাঁচুমাচু মুখে বলে—ওপারে গিয়েছিলুম। কপালীর জঙ্গলে। কাঠ কুটো আনতে গিয়ে দেখলুম। খারাপ জায়গার নয়।

এই সময় মন্দিরা ডাকেন—মালু কোথায় রে? কখন থেকে নেই।

গেনুর মার জবাব—জেঠিমার কাছে। আবার কোথায়।

তুলেবউ বলে—মালুদি কপালীর জঙ্গলে বসে আছে, দেখে এলুম।

মন্দিরা হাঁ করে তাকান। বিশ্বাসই করতে পারেন না।

- হ্যাঁ। বসে আছে। একটা ফর্সামত ছেলের সঙ্গে। ওনার হাতে বন্দুক আছে।

সবাই মুখ তুলে শুনছিল—চুপচাপ কয়েকটা মুহূর্ত। সব চোখেই বিস্ময়। তারপর মন্দিরা হেসে ওঠেন। সব দ্রুত চাপা দিতে থাকেন। —ও! সুকুর বন্ধু বন্দুক নিয়ে গেছে পাখি মারতে। মদনও গেছে সঙ্গে। দাদার বন্ধু—দাদার মত। যেতে দোষ কি? গেছে। আজ-কালকার ছেলেমেয়ে সব। দাদাদের সঙ্গে···গেনু। কাকটা তাড়া। হেগে দেবে।

তুলেবউ বলে—মদ্‌নাকে তো দেখলুম একগুচ্ছের পাখি নিয়ে বকুলতলায় বসে আছে। বলে—বিলবাদাড় চষে কেলান্ত। জিরোচ্ছি।

বকুলতলা গাঁয়ের শেষে—নদীর ঘাটের কাছাকাছি। এপারে। মন্দিরা ধমক দেন—হয়েছে, হয়েছে! হাত চালাও তো সব। কথা পেলেই হল!····

কুঁচফলের ঝোপের পাশে ছাতিমের ছায়া ঘুরে দিব্যের পিঠভরা রোদ। সে বাঁহাতের তালু শুকনো ঘাসে চেপে একটু হেলে পা দুটো বাঁকা করে ছড়িয়ে বসেছে কোলে বন্দুক, ডানহাতে ঘাসের কুটো। মধুমালা তেমনি দু'হাঁটু বাঁকা করে বসে আছে—হাঁটুর ফাঁক দিয়ে দুটো হাতের আঙুল ঘাস ছিঁড়ছে। মুখ দু'হাঁটুর ফাঁকে ঝুলন্ত। বাঁদিকটা দেখা যাচ্ছে, কানের রিং চুলের ফাঁকে ঝিলমিল করছে মাঝে মাঝে। পিঠে চুলের নড়াচড়া। দিব্য বলে—তুমি শুনছ না কিছু।

মধুমালা ওইভাবে থেকেই জবাব দেয়—শুনছি।

—শুনছ, কিন্তু বুঝতে পারছ না।

মধুমালা মাথা দোলায়।

—কেন পারছ না? আমি বাংলায় বলছি—তোমার মাতৃভাষায়।

মধুমালা তবু মাথাটা নাড়ে।

আর অমনি দিব্য ডান হাত তার বাঁ কাঁধে থাবার মত ফেলে ঘাড় ঘুরিয়ে দিতেই মধুমালা মুখ তোলে। তাকায়। কিন্তু মুখে অন্য রকম চাপা হাসি—অর্থাৎ কোন ধ্বনির যেমন প্রতিধ্বনি। হাসির প্রতিফলনই বা। এ কিসের হাসি, তা বোঝাবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম। হয়তো একটা স্বাভাবিকতা। সে বলে—কিন্তু আর কাকেও পেলেন না? আমাকে বাগে পেয়েই শোনাতে দৌড়লেন? বাঃ!

দিব্য মুখ নামায়। সত্যি তো। কেন এই এঁচোড়ে পাকা মেয়েটাকে দেখামাত্র কনফেশনের নেশা চড়ে গেল তার মাথায়? একটা যুক্তি হাতড়ায় সে। মনে পড়ে যায়, স্টেশনে বসে চা খাবার সময় একটু দূর থেকে সকালের রোদে ঝলসান একটা সৌন্দর্য দেখে আপনমনে ও মুগ্ধতায় ঠোঁট দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল - বাঃ। এবং সঙ্গে সঙ্গে কাল সন্ধ্যা থেকে সারারাত, ভোর ও সকালঅব্দি চাপা মাথাকোটা যন্ত্রণার ছটফটানি এক চুমুকেই যেন পান করে নিয়েছিল সেই সরল সৌন্দর্য। এখন সে এত কাছে চলে এসেছে, দিব্য সামলাতে পারেনি নিজেকে। কিন্তু এখন একদমে হুড়মুড় করে বলে ফেলার পর নিজেরই খারাপ লাগতে থাকে। নিজের ওপর রাগ হয়। মেয়েটা হয় তো বোকাহাবা, ভেতরে-ভেতরে গো-বেচারা, নিতান্ত খুকু—কী করতে কী করে বসবে, উদ্বেগ জাগছে।

মধুমালা আবার বলে, মুখটা গম্ভীর—বাবা আইন জানেন। আসামী খালাস করেন। বাবাকে বললেই পারতেন। কত বিচ্ছিরি-বিচ্ছিরি কেসের আসামী খালাস করেছেন বাবা।

দিব্য দ্রুত মুখ তোলে। রূঢ়স্বরে বলে—না, তা নয়।

—তাছাড়া কী? মানুষ মেরেছেন। মেরে পালিয়ে এসেছেন। ফেরারী আসামী হয়েছেন। মোক্তারবাবুদের কাছে যান। ....বলতে বলতে এতক্ষণে মধুমালা খিল খিল করে হেসে ওঠে।

দিব্য অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। রাগ, বিরক্তি ও গ্লানি ঢেকে শান্তভাবে বলে—তুমি কী পরামর্শ দেবে, তা শোনার জন্যে কিছু বলিনি তোমাকে।

—হুঁ, বলেছেন, আমার বাবা মোক্তারী করতেন কোর্টে—তাই। আইন জানেন—তাই। সরাসরি ওঁকে বলতে পারেননি, লজ্জার খাতিরে। হাজার হলেও বন্ধুর বাবা, গুরুজন। কোনমুখে হুট করে বলা যায়? তাই আমার থ্রু দিয়ে। বেশ বুঝেছি বাবা!....মধুমালার গল গল করে কথা বের হতে থাকে। আবার বলে—হুঁ, এসেই ধরে ফেলেছেন যে ছাই ফেলতে আমিই ভাঙা কুলো! আজ সকালে যেমন আপনাদের আনতে স্টেশনে চাকর পাঠানো হল না! খুকু, তুইই যা। ছাই ফেলতে এই ভাঙা কুলো সবতাতেই। একটু দম দিয়ে ফের বলে সে—ঠিক দাদাও এমন করেছে কতবার। আমার থ্রু দিয়ে বাবাকে ধরেছে। এই খুকু, বাবাকে বলিস্ না ভাই! সুকুমারের গলার স্বর ও ভঙ্গী নকল করে মধুমালা।

দিব্য সোজা হয়ে বসে চাপা গর্জায়—না।

মধুমালা একটু ভড়কে যায়। তাকায়, নিষ্পলক। ঠোঁটের হাসিটা গালের চামড়ায় সরে যেতে মিলিয়ে যায় কানের দিকে। মনে হয়, হাসিটা সোনার রিঙের মধ্যে গিয়ে মিশল এবং ওত পেতে থাকল। সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে আসবে।

দিব্য শ্বাসপ্রশ্বাস মিশিয়ে বলে—ভেবেছিলুম তোমাদের এখানেই কয়েকটা দিন থাকব। তারপর চলে যাব কোথাও। কোথায় যাব কিংবা কী করব সেটা ঠিক করার জন্য কয়েকটা দিন সময়ের দরকার

ছিল। তাই অন্তত একজন বিশ্বাসী কারও আমার ব্যাপারটা জেনে রাখা ভাল ছিল। সে আমাকে গার্ড দিত। হ্যাঁ—বাড়ির অন্তত এমন একজন, যে আমাকে ঘৃণা করবে না, ভয় পেয়ে হুলুস্থুল বাধাবে না—স্বাভাবিক বলে মেনে নেবে। এমন একজন—যে সবসময় আমাকে বাইরের কোন মুভমেণ্ট আঁচ করে তক্ষুনি জানাবে। এইসব ভেবেছিলুম আমি। সুকুমার? অসম্ভব। তার নার্ভের খবর আমার জানা আছে। সে ভীতু ছাপোষা কেরানী মানুষের একটা টাইপ। আর শান্ত? একটা ক্লাউন। ওর মনটা নিক্তি দিয়ে মাপলে দশগ্রামের বেশি হবে না। শোনামাত্র আমার কাছ থেকে দিশেহারা হয়ে দৌড়ে পালাবে। তুমি বলছ তোমার আইনজ্ঞ বাবার কথা। আই ডাউট—তিনি জেনে শুনে এমন একজনকে বাড়িতে আশ্রয় দেবেন কিনা! তোমার মায়ের তো প্রশ্নই ওঠে না। উনি সম্ভবত হোসিয়ারিওলার ছেলেটাকে জামাই করার সুযোগ খুঁজছেন।

মধুমালা সঙ্গে সঙ্গে ঝটপট বলে ওঠে—খুঁজছেন তো! সেজন্যেই তো আমি বাড়ি থেকে চলে এলুম কপালীর মন্দিরে। সেজন্যেই তো দুঃখ হয়েছিল আমার। কান্না পেয়েছিল। মায়ের কথা শুনে, জানেন আমি আকাশ থেকে পড়েছি। মা এমন ট্রেচারি করবে, ভাবিনি।

দিব্য একটু হাসে। মধুমালা মুখ ঘুরিয়ে ফেলেছে। কান্না এসে গেছে হয়তো। সে আবার হাত রাখে ওর কাঁধে।—শান্ত তোমার যোগ্য নয়।

ক্ষুব্ধ মধুমালা বলে—থাক। ন্যাকামি করবেন না। আপনিই তো ওকে এনেছেন। এমন হয়েছিল তো একা এলেই পারতেন।

—না, আমি আনিনি। বরং আমিই এসেছি ওর সঙ্গে। সুকুর কথা আমার মাথায় ছিল না। হঠাৎ শান্তের সঙ্গে দেখা হল এক জায়গায়। বলল, সে সুকুর এখানে আসছে। আমি বললুম, যাব। কারণ, তখন আমি তো রাস্তায় নেমেছি। পালিয়ে বেড়াচ্ছি। তাই

ওকে আঁকড়ে ধরলুম তক্ষুনি। রাতে ওদের বাড়িতে ওর সঙ্গে এক বিছানায় কাটিয়ে ভোর চারটের ট্রেন ধরলুম শেয়ালদায়। সারারাত ঘুমোইনি। আজ সকালে স্টেশনে নেমে জায়গাটা দেখতে দেখতে মনে হল, আমি এখানে নিরাপদ। তারপর, জানো, তারপর হঠাৎ প্লাটফর্মে দেখলুম তোমাকে—কী যে লাগল! সব আতঙ্ক, ছটফটানি, গ্লানি তক্ষুনি পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এখন কী লাগছে, জানো? আগে তোমার সঙ্গে চেনা থাকলে····

দিব্য আবেগ সামলে নিয়ে চমকে ওঠে। সুকুর বোনের চোখে আবার জল টল টল করছে। দূরের দিকে দৃষ্টি। অস্পষ্টভাবে সে বলে ওঠে – কেন এসব বলছেন আমাকে?

—বলতে ভাল লাগছে।

—আমার সঙ্গে চেনা থাকলে কী করতেন?

—স্কাউণ্ড্রেলটাকে মারতুম না। সহজেই ক্ষমা করতে পারতুম। শুধু তাকে কেন, পৃথিবীর সবাইকেই ক্ষমা করা যেত। শুধু তোমার খাতিরে মধুমালা!

—আমি কী? কেন আমার খাতির?

দিব্য মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে মাথা দোলায় শুধু। কপালে তিনটে ভাঁজ আবার স্পষ্ট ফুটে ওঠে। বড় বড় দুই চোখের বিশাল মুগ্ধতা জ্বল জ্বল করে। তখন মধুমালা মুখ নামায়। তার বুক ধুক ধুক করতে থাকে অজানা ভয় অথবা উদ্বেগে! উরু ভারি লাগে। অবশ হয়ে যায় সারা শরীর। পৃথিবী যেমন নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টি রেখে মহাশূন্যে ভেসে চলে—দুর্জ্ঞেয় এক নৈসর্গিক নিয়মে, অসহায়, ইচ্ছা-নিরপেক্ষ, তেমনি করে তাকিয়ে মুখ নামায় মধুমালা।

প্রজাপতিটা এসেছিল! সাদা ফুটফুটে কুচুটে প্রজাপতিটা। ছটফটে। মেরে ফেলল। হাত ভরে গেল সাদা গুঁড়োয়—সবুজ রক্তে। কিন্তু আবার একটা এল। ওর বুকে বসে পড়ল। আবার উড়ে গেল।

মধুমালা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে সেই মিরাক্‌ল্‌। এখন দুটো প্রজাপতিই উড়ে বেড়াচ্ছে জঙ্গলে। সারা দৃষ্টি জুড়ে দুটো সাদা ছটফটানি। মন কেমন করে—শুধু কেমন করে।....

হঠাৎ দিব্য বলে ওঠে—তুমি আমাকে ঘৃণা করছ?

—উঁ?

—আমি মার্ডারার, মধুমালা। খুনী। কিন্তু তোমাকে তো বলেছি, কেন অসীমকে আমি খুন করলাম। হয়তো করতুম না, এড়িয়ে যেতুম। কিন্তু দিনের পর দিন শুওরের বাচ্চা আমায় ব্ল্যাকমেইল করে যাচ্ছিল। কবে কোথায় খেয়ালের বশে কী করেছি, সে মোহ ভেঙেছে, এম. এ. পরীক্ষা দিয়েছি, পাস করেছি, সাধারণ মানুষের মত লাইফটা কাটাতে চাইছি। ব্যাংকে একটা মোটামুটি ভাল চাকরিও পেয়েছি। হঠাৎ দেখি, একদিন অন্য ব্রাঞ্চ থেকে বদলী হয়ে এল অসীম মজুমদার। ব্যাস্টার্ড! সিক্সটি সেভেনে পার্টির এ্যাকশন স্কোয়াডের লিডারের কিছু চিঠি—পার্সোনাল চিঠি সেগুলো, ওর কাছে রেখে দিয়েছিলুম। তখন আমার ছোটাছুটির সময়। তাই। চিঠি-গুলোতে অন্য কিছু প্রমাণ হবে না—হবে যে কোথায় কাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। তারপর, পরে মোহ কাটিয়ে কলকাতা ফিরে শালাকে আর খুঁজেই পেলুম না। এ্যাদ্দিন বাদে হঠাৎ আবিষ্কার করলুম, ও একই ব্যাংকে আমার মত চাকরি করছে।...

দিব্য দম নিয়ে ফের বলে—এই একবছরে কয়েকহাজার টাকা ক্যাশে এবং মদে ব্যাস্টার্ডকে উপহার দিতে হয়েছে। মাসের পয়লা তারিখে মাইনে পেলেই ও সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রথমে ধার চেয়েছে, ফ্যামিলির দায়টায় নিয়ে কান্নাকাটি ভ্যাজর ভ্যাজর করেছে, তারপর আস্তে আস্তে নিজের মূর্তি ধরেছে। আশ্চর্য. আমি হঠাৎ এত বদলে গিয়েছলুম এই ক'বছরে—ভীতুর ভীতু, বোকার বোকা, ছাপোষা নিরীহ গেরস্থের মত! বাইরে বেলবটস, ভেতরটা শ্যাবি—

দীনহীন, পোড় খাওয়া রোগা নেড়ি কুকুর। যত টের পেতুম ভেতরের এই অবস্থাটা, তত স্মার্ট হতে চেষ্টা করতুম। সেজেগুজে থাকতে চাইতুম। এখনও সেই টাইপটা দেখতে পাচ্ছ! নিজের ওপর ঘেন্না হত, মধুমালা। ঘেন্না হত, রাগ হত। ক্ষেপে যেতুম। কলেজ জীবনে রাইফেল ছোঁড়ায় নাম ছিল। টিপ অব্যর্থ ছিল। প্রথম পলিটিক্যাল স্পট্ পড়তে না পড়তে রাইফেলটা নিয়ে নিল পুলিস। তারপর....

একটু চুপ করে থেকে সে বলে—গুছিয়ে বলতে পারছিনে মনের অবস্থাটা কোথায় দাঁড়িয়েছিল। নিজের প্রতি সেই ঘৃণাকে চরমে তুলে দিল অসীম মজুমদার। এই শালা লাইফ! লাথি মারো! আমি ডিসিশন নিলুম। ঠাণ্ডা মাথায় এগোলুম টার্গেটের দিকে। কাল সন্ধ্যা ছ'টায় ওর বাসায় গেলুম। ওর স্ত্রী আমায় খাতির করে বসাল। ও ছিল বাথরুমে। যেই দরজা খুলে বেরিয়ে একগাল হেসে বলল—আরে! তুমি যে! আমনি গুলি ছুড়লুম। ওর স্ত্রী চেঁচিয়ে উঠল। ওর ছেলেমেয়েরা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। পালিয়ে এলুম। ওঃ! এই শালা লাইফ! সব মনে পড়ে যাচ্ছে।

দুহাতে মুখ ঢাকল দিব্য। মধুমালা ওর কাঁধে হাত রেখে বলে—এক কথা হাজারবার বললে কষ্ট হবে না আবার? যেচে পড়ে এইসব ভ্যান ভ্যান। ভ্যাট! চুপ করে থাকতে পারেন না?

দিব্য মুখ তোলে না দেখে সে ডাকে—দিব্যদা! এই! শুনছেন?

দিব্য শূন্যদৃষ্টে তাকায়।

—এসব তখন ভাবেন নি কেন? এখন আর পস্তে কী হবে, শুনি?

কী নাবালিকা মেয়েটি! দিব্য কষ্টে একটু হাসে। মাথা নেড়ে বলে—না, পস্তাইনি।

—তবে এসব কথা কেন? জানতেন না, ছেলেমেয়ে বউয়ের সামনে কাকেও খুন করলে তাদের মনে কী হয়? একটা মানুষের বড় হতে কত সময় কত কষ্ট লাগে বোঝেন না? এম. এ. পাশ করেছেন?

দিব্য আস্তে বলে—আমার ফাঁসি যাওয়া উচিত, তাই না মধুমালা?

মধুমালা জোরে মাথা দোলায়।—না, আমি তা বলিনি।

—আমার ধরা দেওয়া উচিত, কী বলো?

—না, না, না। আমি তা বলিই নি।

—তবে কী বলছ?

অন্তত দু' মিনিট চুপ করে থাকার পর মধুমালা খুব শান্ত ও স্বাভাবিক গলায় বলে—কপালীর মন্দিরে এসেছিলুম মন খারাপ নিয়ে। কতবার এসেছি। এসে লুকিয়ে কেঁদেছি, মানত মেনেছি—তখন মন ভাল হয়ে গেছে। হাসতে হাসতে ফিরে গেছি বাড়িতে।

—আজ?

—আজ? আমার আর বাড়ি ফিরতেই ইচ্ছে করছে না····

মদনবুড়ো পাখি তিনটে নিয়ে বাড়ি ঢুকতেই মন্দিরা তেড়ে যান—এস, মহিষাসুর এস এতক্ষণে! ঢাকঢোল বাজুক! কী করছিলে বকুলতলায়? এ্যাঁ? যাকে নিয়ে গেলে, তাকেই বা কোন আক্কেলে বনজঙ্গলে একলা রেখে সঙের মত চলে এলে? এতটুকু বুদ্ধি হল না ষাট বছরে নাবালকের? আবার দাঁত বের করে হাসা হচ্ছে?

মদন বলে—কলকাতার বাবুর হাতে অস্তর আছে। কপালীর জঙ্গলে আর বাঘ নাই। ইদিকে মালুদি শুনলুম গিয়ে বসে-বসে কথা বলছেন।

দোষ খণ্ডনের জন্য আর বেশি কথা খরচের দরকার হবে না, মদন এটাই যথেষ্ট মনে করেছে। গেনুর মা বলে—আজ যে মহিষাসুর বড় মুখ করে হাঁক ছাড়ছে গো! কথা ফুটেছে।

মন্দিরা ধমক দিয়ে বলেন—কৃতার্থ করেছে। এখন ছোটবাবুকে

দেখিয়ে নিয়ে এস শিকারগুলো। কখন থেকে বলে পাঠাচ্ছে, মদনদা ফিরল নাকি। হাঁদারাম!

মদন থপ থপ করে এগোয়। ধুপধাপ পা ফেলে সিঁড়ি ভাঙে। হাঁটুর হাড়ে মট মট শব্দ ওঠে। সিঁড়ির ওপর ধাপে জগা কলরব করে—পাখি! পাখি!

মদন নিঃশব্দে ঢোকে। পাখিশুদ্ধ ঝুঁকে প্রণাম করে। তারপর হাত তুলে দেখায় পাখিগুলো।

সুকুমার গম্ভীর মুখে বলে—দিব্যবাবু কোথায়? নীচে?

মদন দাঁত বের করে।- আজ্ঞে না। কপালীর জঙ্গলে মালুদির সঙ্গে বসে আছেন।

শান্ত সুকুমারের দিকে তাকায়। সুকুমার বলে—খুকুর সঙ্গে?

মদন মাথা দোলায়।

ঘরে গুমোট ভাব কিছুক্ষণ। তারপর সুকুমার বলে ওঠে—আশ্চর্য! তা, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? আমরা কি পাখিগুলো গিলে খাব বুদ্ধু কোথাকার?

॥ পাঁচ ॥

—বারে বারে রোদ যাসনে, সানষ্ট্রোক হবে। সুকুমার বলেছে শান্তকে। ছাদে ঝাঁ ঝাঁ রোদ আর প্রায় লু বইছে। তার মধ্যে বার বার শান্ত দক্ষিণের দরজা দিয়ে ছাদে ঘুব ঘুব করে আসছিল। দু-একবার জিগ্যেস করেছিল, নদীটা কোনদিকে। তার মুখটা থমথমে। সুকুমার লক্ষ্য করেছে সেটা। ভেবেছে, দিব্যের রিভলবারই ওকে ক্ষুব্ধ করেছে।

কিন্তু শান্ত ক্রমশ রিভলবারের কথাটা ভুলে গেছে। দিব্য তার হামলার লক্ষ্য এখন। হ্যাঁ, দিব্যের এই ঈর্ষাজনক ক্ষমতাটা আছে, সে জানে। শালা মানুষ পটাতে ওস্তাদ। কথা কম বলে, বাঁকা চোখা মন্তব্য করে, স্পষ্টভাষী—অথচ লোকগুলো পটেও যায়। কিন্তু এখানে আসা মাত্র কখন কোন ফাঁকে সুকুমারের বোনকে পটাল, সে খুঁজেই পাচ্ছে না। গোয়েন্দার মত দিব্যের গতিবিধি ঘড়ির কাঁটার হিসেবে সে মিলিয়ে নিচ্ছে—কখন দিব্য বেরোল, বাইরে কতক্ষণ ছিল, কীভাবে মেয়েটার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল—এ নিয়ে একটা প্রকল্প সে দাঁড় করাচ্ছে। সবচেয়ে অবাক লাগে মেয়েদের কাণ্ড দেখে। বরাবর সে দেখেছে, যতসব মাস্তান মার্কা বাজে ছেলেদের সঙ্গেই সুন্দর মেয়েরা ঘুরছে। এখানেও তাই হল। আসলে মেয়ে জাতটাই এমন। নিজে থেকে বদমাইসের পাল্লায় পড়ে! শেষটা গণ্ডগোল হলে কোর্টে দাঁড়িয়ে সোজা বলে দেবে—ধর্মাবতার, আমি সরলা অবলা বালিকা। ওই লোকটা ভুলিয়ে ভালিয়ে আমার সর্বনাশ করেছে। আশ্চর্য! জজসায়েবও তাই বিশ্বাস করবেন! খবরের কাগজে লেখা হবে, ভুলিয়ে ভালিয়ে অর্থাৎ প্ররোচিত করে আসামী

এই যুবতীর শ্লীলতাহানি ঘটায়। খুকী তুমি? গাল টিপলে দুধ বেরোচ্ছে? যখন আগুনে হাত বাড়াচ্ছিলে, জানতে না হাত পুড়ে যাবে? তুমি ঠিক থাকলে কে তোমায় কড়ে আঙুল ছুঁতে পারে শুনি? হুঁঃ, আসলে ব্যাপারটা হয়েছে এই। নিছক গাঁয়ের মেয়ে। কলকাতার এক ব্রাইট মাস্তানকে দেখেই চোখ ধেঁধে গেছে। শান্ত অস্ফুট স্বগতোক্তি করেছে—এ্যাণ্ড শী হ্যাজ লস্ট হার সেন্স এ্যাণ্ড আইজ।

শেষবার ঘুরে এসে শান্ত বলে—ওরা আসছে।

সুকুমার অন্যমনস্কভাবে বলে—কারা?

শান্ত ইচ্ছে করেই ব্যাপারটা সুকুমারকে ধরিয়ে দিতে চায়। বলে—তোর বোন। মানে দিব্যকে নিয়ে আসছে। জঙ্গলে পথ-টথ হারিয়ে ফেলেছিল নিশ্চয়।...শান্ত হো হো করে নিস্প্রাণ হাসে।

সুকুমার বলে—হবে। তবে খুকু একটু খেয়ালী টাইপের, নিশ্চয় টের পেয়েছিস? ছেলেবেলা থেকেই ঘুরে বেড়ানো অভ্যাস। কতবার স্কুল পালিয়ে ওপারের জঙ্গলে কুল খেতে গেছে। বাবা খুঁজতে লোক পাঠিয়েছেন। ভীষণ জংলা টাইপ ছিল তখন। আজকাল আর ততটা নেই। স্বভাবত বদলে যাচ্ছে।

শান্ত গম্ভীর হয়ে বলে—পাড়াগাঁয়ে এভাবে যেখানে-সেখানে মেয়েদের পক্ষে ঘোরা বোধহয় রিস্কি। তাই না?

সুকুমার মাথা নাড়ে।—নাঃ। কিসের রিস্ক? তাছাড়া বাবাকে এলাকায় সবাই একটু ভয়টয় করে। আমাদের বাড়ির মেয়েরা সারারাত মাঠে ঘুরে বেড়ালেও যমে ছোঁয় না। প্রথম এলি তো? এ বাড়ির ট্রাডিশন, ইনফ্লুয়েন্স, প্রেসটিজ খুব আনকমন। দাদু জমিদার ছিলেন কিনা। যাক গে—স্নান করবি কোথায়? বাথরুম অবশ্য আছে—সেখানে মেয়েরা স্নান করে। পুরুষদের জন্যে মুক্তাঙ্গন। নীচে বসার ঘরের বারান্দায়—যেখানে ওয়াশ করলি, আর কুয়োতলায় এবং

একটু বেপরোয়া হলে পুকুরে। ওই তো পুকুর—আমাদেরই। বাঁধানো ঘাট আছে। জলটাও ভাল!

শান্ত বলে—আমি ভাই পুকুর-টুকুর নয়, খোলা বারান্দাতেও নয়—কুয়োতলায় যাব।

—তাই যাস। নিরিবিলি ওদিকটা। বাড়ির বাইরে—নেকেড হয়ে চান করলেও কেউ দেখার নেই।—সুকুমার হাসতে থাকে।

—সে দিব্যটা পারে। ও ঠিক তাই করবে দেখবি।

সিঁড়ির মুখে চটির শব্দ হল। তারপর দিব্য ঢুকল। ফর্সা সাহেবী রং তামাটে, পুড়ে বিকৃত মুখ, বন্দুকটা আগে দেয়ালে সাবধানে ঠেস দিয়ে রাখে সে। তারপর পকেট থেকে দুটো তাজা কার্তুজ বের করে সুকুমারের দিকে এগিয়ে যায়।

সুকুমার তাকিয়ে আছে। হাত বাড়িয়ে কার্তুজ দুটো নিয়ে বলে—একটা বাজে খরচ মোটে। আমি হলে তো দুটোই যেত। তুই সাংঘাতিক শিকারী দেখছি!

দিব্য জামা খুলতে খুলতে বলে—একটা তোর বোন ফায়ার করেছে!

সুকুমার চমকে উঠে বলে—খুকু?

—খুকু আর খুকু নয়। শী ইজ এ রিয়্যাল লেডি। বলে দিব্য হাসে এবং সোফায় গিয়ে বসে। সিগ্রেটের প্যাকেট তার হাতে। জামাটা সুকুমারের খাটে পড়ে আছে। শান্তকে বলে—দেশলাই দে। আমারটা শেষ। ফেলে দিয়েছি।

শান্ত নিঃশব্দে দেশলাই দেয়। দিব্য সিগ্রেট ধরিয়ে রিং পাকাতে থাকে। সুকুমার বলে—খুকু কিসে ফায়ার করল?

—শূন্যে।

—শূন্যে?

—আকাশে।

তারপর স্তব্ধতা। একমিনিট, দুমিনিট, তিনমিনিট গেল। তখন দিব্য বলে—কী হয়েছে তোদের?

সুকুমার শুকনো হেসে বলে—কী হবে? কিছু না।

হঠাৎ ঘোরে দিব্য। শান্তকে বলে—তুই আমার ব্যাগে হাত দিয়েছিলি?

শান্ত থতমত খেযে বলে—কে বলল? যাঃ!

দিব্য উঠে দাঁড়ায়। ব্যাগটার দিকে এগিযে যেতে যেতে বলে—নিশ্চয হাত দিয়েছিলি। আমার ব্যাগটা এই পজিশনে ছিল না। আর এই বইটাও ছিল তলায় গোঁজা—এখন উল্টোদিকে বেরিয়ে আছে।

শান্ত জোব হাসে।—সিগ্রেট চুরি করতে গিয়েছিলুম।

দিব্য ততক্ষণে ব্যাগেব ভেতর হাত ভরে সব দেখাশোনা করছে। ভুরু কুঁচকে বলে—কিন্তু সিগ্রেট নিসনি।

—নাঃ!

—নিসনি, অথচ বলছিস সিগ্রেট চুবি করতে গিয়েছিলি।

—ভেবেছিলুম····

—কী ভেবেছিলি?

সুকুমার চাপা অস্বস্তিতে অস্থির হয়ে বলে—দিব্য! প্লীজ!

—শান্ত, তুই এই প্যাকেটটাও খুলেছিলি?

শান্ত নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে তার দিকে। সুকুমার ব্যস্তভাবে ফের বলে—দিব্য! প্লীজ—ছেড়ে দে। স্নানের সময় হয়েছে, রেডি হ। দেড়টা বাজে প্রায়।

—এই বাফুন! কথা বলছিস না কেন? হোয়াই ডিড ইউ পুট ইওর স্যাষ্টি হ্যাণ্ড ইইন মা ব্যাগ?

তখন শান্ত একটু হাসে। বাঁকা ধরনের হাসি।—বেশ করেছি।

এক পা এগিয়ে যায় দিব্য, একহাতে ব্যাগ।

শান্ত দ্রুত বলে—যাঃ বাব্বা! মাল টাল আছে নাকি খুঁজতে গেলুম—তাতে এমন কি হয়েছে? তুই কি মেয়েছেলে—না স্মাগলার যে এত টপ সিক্রেট কারবার?

দিব্য আর এক পা এগোতেই সুকুমার চাদর ফেলে ধুড়মুড় করে ওঠে। ছুটে এসে মাঝখানে দাঁড়িয়ে দিব্যের কাঁধে হাত রাখে।—দিব্য! দিব্য! প্লীজ ভাই। সিন ক্রিয়েট করিসনে। মুখ দেখাতে পারব না বাবা-মাকে। তোদের কত প্রশংসা করেছি—ছি—ছি!

দিব্য হিস হিস করে বলে—এটা যদি অন্যের বাড়ি না হত, ওই দেড়েল বাফুনটার দাড়ি ছিঁড়ে ফেলতুম! সব ব্যাপারে ওর নাক গলানো চাই-ই।

সুকুমার ওকে টেনে খাটে নিয়ে যায়। জোর করে বসিয়ে দেয়। তারপর বলে—দিস ওয়াজ কোয়াইট আনএক্সপেকটেড। তোরা না এডুকেটেড ছেলে, দিব্য? ছিঃ। দিব্যি দুজনে এলি হাসতে হাসতে একসঙ্গে। তারপর হঠাৎ কী যে হল বুঝতে পারছি না আমি! বন্ধুর জিনিসে হাত দিয়েছে—এতে....

দিব্য বাধা দিয়ে বলে—ব্যাপারটা তা নয়, সুকু।

সুকুমার বলে—তোর এত একসাইটমেণ্টের একটা কারণ অন্তত আমি বুঝতে পারছি। দ্য উয়েপন্। এই তো? কিন্তু শান্ত তো বাইরের কারও সামনে ওটা খোলেনি। যা দেখার, দেখেছি মাত্র আমরা দুজন। বিলিভ মি, ঘরে তখন বাইরের কেউই ছিল না। আমরা তো বন্ধু আফটার অল। অথচ মনে হচ্ছে, তোকে যেন পুলিসের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে। ইফ ইট ইজ এ সিক্রেট, দেন ইট উইল রিমেন এ সিক্রেট।

শান্ত গজ গজ করে এবার।—ওসব কাকে কী বলছিস? আসলে আমারই ভুল হয়েছে ওর সঙ্গে আসা। আসতে চাইল—সকাল সকাল পৌঁছবে বলে নিজেই প্রোপোজাল দিল—বলল, দুপুরে রোদ বেড়ে

যাবে। ভোরের ট্রেনে যাওয়াই ভাল। তক্ষুনি ফোন করে ফাস্ট ট্রেনের সময় জেনে নিলুম—ভোর চারটেয়। তখন নিজে থেকেই বলল —আমার, অত ভোরে ঘুম ভাঙবে না, বরং তোর কাছে থাকব। থাকল। তারপর...

সুকুমার বাধা দিয়ে বলে—থাক। আর ওসব আলোচনা করে লাভ নেই। তোরা এসেছিস, আমি খুশি হয়েছি। ব্যস! কিন্তু এমন হলে সত্যি আমি বড্ড কষ্ট পাব।

দিব্য আস্তে বলে—তোকে কষ্ট দিতে আমি আসিনি, সুকু।

—কিন্তু এই তো দিচ্ছিস।

দিব্য মুখ নামিয়ে বলে—ক্ষমা চাইছি।

—ভ্যাট! ক্ষমা কিসের?...বলে সুকুমার ওর পিঠে মৃদু থাপ্পড় মারে।—লেট আস ফরগেট ইট। শান্ত, কোথায় স্নান করবি?

—বললুম তো, কুয়োতলায়।

—দিব্য, তুই?

—পুকুরে।

—জগা, নীচে খবর দে। এঁরা চান করতে যাচ্ছেন!

দিব্য তিন-তিনবার তার বাঁ কাঁধের যেখানটায় হাতের চাপ দিয়েছিল, সেখানটা এখনও কেমন হয়ে আছে। হাতটা এখনও যেন আঁকড়ে ধরে আছে তাকে। এই প্রথম হাত! আরে, মুখ ঘোরাতে গিয়ে কী একটা গন্ধের ঝাপটানি লেগেছিল। ঠিক ঘামের গন্ধ নয় —এসেন্স জাতীয় কিছু নয়, যা দাদার পোশাক গোছাতে টের পায়— মাঝামাঝি রকমের কিছু। কিছুক্ষণ অন্তর-অন্তর ভেসে আসছে। মধুমালা যত ভাবছে, এসব কিছু না, কিছু না—তত তার লজ্জা। তত আড়ষ্টতা। একলা ঘরে আর মুখ তুলে সোজা দাঁড়াতে পারছে না।

তার চারদিক থেকে একটা জোরালো পুরুষতা তার গায়ে ছায়া ফেলেছে। সে টের পায়, এই ছায়া থেকে সে বেরুতে পারছে না, হয়তো আর পারবেও না।

কয়েক মিনিট আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সন্দিগ্ধ চোখে নিজের শরীর দেখে নিয়েছে। নদীর ওপার থেকে ফিরে কিছু কি চোখে পড়ার মত বদল ঘটে গেছে? বাড়ি ঢোকার মুখে তো সে কী হয় কী হয় অস্বস্তি নিয়ে পা ফেলছিল। মায়ের যা চোখ। ধরে ফেলতে দেরী হবে না যে মধুমালার শরীরটাই কত বদলে গেছে। বলবেই বলবে— ও খুকু, কী হয়েছে তোর?

বলেনি কেউ। সাঁৎ করে নিজের ঘরে ঢুকে পড়েছে থামের আড়াল দিয়ে। প্রথমেই বাঁ কাঁধ শুঁকেছে বার বার। আরাম লাগে, ঘেন্নাও লাগে, কিন্তু তারপর যত মিনিটগুলো এগোল, বয়স মিনিটে মিনিটে বাড়ল—সে চম্‌কে চম্‌কে উঠতে থাকল। নিজের কাছে ধরা পড়ার লজ্জায় তার মাথা কাটা যায় যেন।

মধুমালা বাইরে থেকে ঘরে ঢুকেই প্রথমে দুম করে খাটে গড়িয়ে একবার পড়বেই। পা দুটো মেঝেয় থাকবে। হাত দুটো ওপরে এবং চোখ বোজা। দু' এক মিনিট ওভাবে থাকার পর চোখ খুলবে। তারপর হুড়মুড় করে উঠে বসবে। এই তার অভ্যাস।

এখন তার উঠতে ইচ্ছে করছে না। চোখ খুলতে চাইছে না। চোখের পাতা ফেলে রেখে দৃষ্টিহীনতার লাল নীল হরেক রঙা এক আজব অন্ধকারে কাকে খুঁজছে, কিছু খুঁজছে। এখন কতসব অলৌকিক দৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু অবশেষে লাল নীল হলুদ রঙের খেলার মধ্যে কে একজন চেহারা ধরে জেগে উঠতে চায়। তার টকটকে ফর্সা রং, লম্বা লম্বা শক্তিশালী আঙুল, কাঁধছোঁয়া অঢেল চুল, বড় বড় চোখ পৃথিবীকেও ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে উদ্দেশ্যহীনতায়।

তন্ময় হয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ সে টের পায়, চোখ খুলে দেখতে পাওয়া পৃথিবীটা কখন অসম্ভব ভরে গেছে এক বিশাল পুরুষের উপস্থিতিতে। অমনি চমকে উঠে চোখ খোলে।

তার মনে হয়, মাথার পিছন দিকে বা শিয়রে—যেখানে কেউ দাঁড়ালে মানুষ কিছুতেই তাকে দেখতে পায় না, সেখানে বন্দুক হাতে দিব্য দাঁড়িয়ে আছে। আবার মধুমালার লজ্জা। আবার বুক ধুক ধুক করে ওঠা। আবার গায়ের চামড়ায় কাঁটা ফুটে ওঠা। সে নিজেকে মনে মনে বলে—এই মেয়েটা! তুই নির্ঘাৎ মরেছিস!

তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যায়, দিব্য কেন এসেছে এখানে। দিব্য ফেরারী খুনী আসামী। অমনি মধুমালার বুক তোলপাড় করে এক মহান দুঃখের আবেগ গলা ঠেলে আসে। তার ইচ্ছে করে আকাশ পাতাল কপালীতলা কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—তুমি চলে যাও সামনে থেকে। দূর হয়ে যাও। তোমার মুখ আমি দেখব না। না—না —না।

....তুমি অত সুন্দর। তোমার হাতে খুনীর রক্ত। পৃথিবীর মানুষরা তোমার বিচার করবে আজ। অথচ অত ছোট নও তুমি। অনেক উঁচুতে তোমায় দেখেছিলুম—কতবড় আকাশের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলে! না—এসব তোমায় মানায় না! কামিনীগাছটাকে অপবিত্র করা, পাখি আর মানুষ খুন, বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি, হঠাৎ চটে-ওঠা বদমেজাজ! তুমি যেদিকে হেসে মুখ ফেরাবে, সেদিকে সকাল হবে। মানুষদের দুঃখ ঘুচবে। যেখানে পা ফেলবে, জেগে উঠবে বাগান। সেই সাদা প্রজাপতিটা কেমন করে তোমার বুক আঁকড়ে বাঁচতে গেল, লক্ষ্য করোনি কি? দুষ্টুছেলে, দেখ তো কী করে বসলে হঠাৎ। কতকগুলো আজেবাজে চাকরবাকর লোক এসে তোমাকে বেঁধে নিয়ে যাবে লোহার গরাদ-ঘেরা খাঁচাকলে। তোমার হাতে-পায়ে শেকল, মাথা ঝুলে পড়বে। তোমার ওপর পৃথিবীর ঘৃণা! কেন? কেন এমন তুমি?.....

—খুকু! ও খুকু! শুলি কেন অবেলায়? আচ্ছা মেয়ে বাবা!....মন্দিরা ঢুকেই মেয়ের কপালে আগে হাত রাখেন।—জ্বর বাধাসনি তো? রোদে বাতাসে ঘুরতে এত বারণ করব, শুনবি না তো।

তারপর মেয়ের চোখে জল দেখে মা অবাক হন।—একী রে। কাঁদছিস কেন? কী হল হঠাৎ? কেউ কিছু বলেছে?

মধুমালা উঠে বসে। রাগ করে বলে—আঃ! পাড়া মাথায় কোর না তো। একটুতেই চেঁচামেচি। মেয়ে যেন আমি একাই আছি কপালীতলাতে।

মন্দিরা অবাক। কিন্তু হাসেন।—ওপারে কেন গিয়েছিলি হঠাৎ? দাদার মত জ্বর বাধিয়ে বসবি যে!

মধুমালা জবাব না দিয়ে আল্‌না থেকে একটা শাড়ি আর তোয়ালে টানতে থাকে।

—চান করবি? কপাল ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে মনে হল যে!

মধুমালা বেরিয়ে যায়। ঠাকুরঘরের বারান্দা হয়ে স্নানঘরে ঢোকে। ওপরটা খোলা। দরজা বন্ধ করে দেয়। তারপর শাড়ি খুলে ফেলে। জামার একটা ক্লিপ খুলেই একটু লজ্জা পায়। মনে হয়, কেউ তাকে দেখছে। একটু বিরক্তি আসে। ভাবে কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর বাঁ কাঁধটা একবার শোঁকে। ফের গা শিউরে ওঠে। তারপর সে এক মগ জল তুলে আস্তে আস্তে মাথায় ঢালতে থাকে। আরামে শরীর জুড়িয়ে যায়। এবং আনমনা ভাবটা কেটে হঠাৎ মনে হয়, কে তাকে দেখছে। তখন দরজার ফাটলে একবার চোখ রাখে। একজায়গায় সাবানের কুচি আঁটা ছিল। খুলে বা গলে পড়েছে কবে।....

এ বাড়িতে আজ যেন উৎসব লেগেছে। কলকলানি কানে ভেসে আসে। সব আয়োজনই সার্থক হত, যদি না গতকাল সন্ধ্যায়

কলকাতার একটা এঁদো গলির বাড়ীতে ছেলেবউয়ের চোখের সামনে এক হতভাগা গুলিবিদ্ধ হত।

পৃথিবীর দূরপ্রান্তের একজন মানুষের ভাগ্যের সঙ্গে অন্যপ্রান্তের একজন বা কয়েকজন মানুষের ভাগ্য কীভাবে যে জড়িয়ে রয়েছে। একটা প্রকাণ্ড সেতারের মতো। কোথাও সূক্ষ্ম আঘাত লাগলে সব তারে ঝনঝন অনুরণন চলতে থাকে কতক্ষণ।

মধুমালার বুকে সেই অনুরণন। ঠোঁট কামড়ে ধরে সে। আবার কান্না পায়।....এভাবে কতক্ষণ ধরে মধুমালা আত্মগোপন করে থাকে। তারপর যখন শুকনো শাড়ি জড়াচ্ছে গায়ে, চুলে তোয়ালে জড়িয়ে রেখেছে—চারু ঠাকুরের হেঁড়ে গলা শুনতে পায় সে।

—হাঁ হাঁ দত্যাৎ
হুঁ হুঁ দত্যাৎ
দত্যাৎ চ করকম্পনে
শিরঃসঞ্চালনে দত্যাৎ
ন দত্যাৎ ব্যাঘ্রঝম্পনে ॥....

হাঁ হাঁ করলেও দেবে, হুঁ হুঁ করলেও দেবে। হাত নাড়লেও দেবে, মাথা নাড়লেও দেবে। যখন বাঘের মত লম্ফঝম্ফ করবে, তখন দেবে না। হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ!

কী ভাগ্যে নিমতেতো মুখে হাসি ফুটেছে চারুঠাকুরের! মন্দিরা করুণ স্বরে বলছেন—কিছুই তো খাচ্ছ না বাবা। ওইটুকুন খেয়ে মানুষ বাঁচে?

শান্ত বলে—খাচ্ছি তো। শরীরটা ঠিক নেই। আবার যখন আসব, তখন....

—না, না। সে হবে না বাবা। অন্তত তিনটে দিন তো থাকতেই হবে। সুকুর জ্বর ছাড়ুক!

—না মা। আজই বিকেলে ফিরতে হবে। কথা দিচ্ছি, আবার....

—সে কী! পাখীর মাংস কে খাবে?

দিব্য বলে—আমি থাকছি। অরিজিন্যাল পাখীর মাংস—নির্ভেজাল! কী বলিস সুকু? তাছাড়া অত পরিশ্রম করে মেরে আনলুম।

সুকুমার হাসে, সে ওই অবস্থায় এসে একটা চেয়ারে বসে আছে। সে দুধ-রুটি খাচ্ছে। তার সুযোগে মাছভাজাও। বলেছে, আজকাল ডাক্তাররা সবই খেতে দেন রুগীকে।

থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে পারিবারিক বিগ্রহ সিংহবাহিনীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করতে করতে মধুমালা এইসব শুনতে পাচ্ছিল। তার প্রণাম আর শেষ হচ্ছে না।

প্রমথ গিয়ে দাঁড়ান। মন্দিরা হাঁউমাউ করে বলেন—শান্ত চলে যাবে বলছে এবেলা। শোন ছেলের কথা! কত সব ইয়ে করেছি। এ যে স্বপ্ন দেখার ব্যাপার।

প্রমথ বলেন - সে কী হয়, বাবা? এই তো এলে। ঘোরো—দেখ। অবশ্য তোমরা কলকাতার ছেলে। এখানে দেখার কীই বা আছে! তবে কী জানো? মাঝে মাঝে লাংএ ফ্রেস এয়ার ভরে নেওয়া ভাল। খাবার দাবারও সব হোমমেড। টাটকা এবং নির্ভেজাল।

তারপরই চলে যান। ব্যস্ত এবং রহস্যময় মানুষ। কোথায় যান, কোথায় ঘোরেন, কী করে বেড়ান ভোর পাঁচটা থেকে রাত দশটা অব্দি, এ বাড়ির কেউ বিশদ জানে না। কখনও কুয়োতলায়, কখনও পুকুর পাড়ে—কখনও গাঁয়ের বারোয়ারি তলায়। আবার কখনও বাজারে ভোলাবাবুর হোমিওপ্যাথির আড্ডায় বসে আছেন।

দিব্য যেন শান্তকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে—বলা যায় না, কালও পাখি মারতে যেতে পারি—পরশু তরশু—অনেকদিন এরকম চলতে

পারে। কী রে সুকু? ঘাড় ধরে বের করে দিবি নাকি? প্রহারেন ধনঞ্জয়?

এই চড়া গলার কথা ফুরোলে সুকুমার বলে—কী বলিস!

আর তার মা শুধু বলেন—বেশ তো! যদ্দিন মন চায়, থাকবে। বলছিই তো থাকতে, বাবা!

কণ্ঠস্বরটা কেমন শুকনো মনে হয় মধুমালার। কথাটা যদি শান্ত বলত, মা দুহাত তুলে ড্যাং ড্যাং করে নাচতেন। মধুমালা হন হন করে বারান্দা পেরিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে।

তোয়ালে খুলে চিরুণী চালায় চুলে। তারপর চিরুণীর চুল এবং জল ঝাড়বার ছলে বারান্দায় আসে। কান করে খাবার ঘরের কথাবার্তা শুনতে থাকে ফের।

দিব্য বলে—সুকু, ইয়ে—মধুমালা খেল না যে? তোদের পারিবারিক রীতিতে পড়ে না সম্ভবত।·· এবং সে জোর হাসে।

দিব্য খুব হেসে হেসে কথা বলছে। স্নানের পর অনেকটা বদলে গেছে মনে হয়।

সুকুমার বলে—না, না। মা, খুকু খেলেও পারত একসঙ্গে!

মন্দিরা বলেন—এই তো এতক্ষণে বকে-টকে চান করাতে পাঠালুম! এখনও হয়তো চান করছে।

গেনুর মা ঘোমটা দিয়ে ওখানে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। মধুমালাকে দেখতে পেয়ে চাপা হেসে বলে দেয়—ওই তো মালুদি! চান সারা। চুল আঁচড়াচ্ছে।

—মালু! দাদারা ডাকছে। আয়, একসঙ্গে খাবি! মন্দিরা ব্যস্ত হয়ে ডাকেন।

দিব্য বলে—এক দাদার খাওয়া প্রায় শেষ। রিয়েল দাদা তো রুগী। অবশ্য আমি ওর না খাওয়া অবধি সমানে খেয়ে যাবার কথা দিচ্ছি।

মন্দিরা ভেতরে-ভেতরে বিরক্ত হন। ছেলেটি কেমন বেহায়া এবং কেমন যেন। মুখে হাসি নিয়ে ডাকেন—ও মালু! আয় মা। দাদারা ডাকছে।

দিব্য সত্যি সত্যি ডাকে—মধুমালা! তোমার জন্যে খাওয়া হচ্ছে না। চলে এস।

তখন মধুমালা চুলে চিরুনী গুঁজে খুব স্মার্ট হয়ে চলে আসে। টেবিলের খালি চেয়ারটায় দিব্যের পাশেই হাসিমুখে বসে পড়ে। পাতগুলো দেখতে দেখতে শান্তের উদ্দেশ্যে বলে—আপনার আবার কি হল?

—এঁ্যা? ঘুম থেকে জাগে শান্ত। তারপর অপ্রস্তুত হাসে।—নাঃ! কী হবে?

এদিকে মন্দিরা ও সুকুমার একটু অবাক হয়েছে। বড় বেশি বাচালতা প্রকাশ করছে যেন মধুমালা। পাগলামি আরও কত শুরু করবে, ঠিক নেই। ওকে ডাকার ইচ্ছে ছিল না এসব কারণে। মন্দিরা মৃদু ভৎর্সনার সুরে বলেন—ও কী রে? অমন করে কথা বলে নাকি?....ঠাকুর মশাই! মালুকে ভাত দাও।

মধুমালা দুষ্টু হেসে বলে —ক্ষিদে পেয়েছে। প্রচুর ভাত দাও।

দিব্য বলে ওঠে আমাকেও। সেকেণ্ড রাউণ্ড। সুকু তোরা দেখে যা শুধু।

মন্দিরা বারান্দায় চলে যান। এ-ছেলেটা কেমন যেন। বড্ড অসভ্য লাগে হাবভাব।....

শান্তকে কিছুতেই আটকানো গেল না। মন্দিরা—এমন কি প্রমথ পর্যন্ত সাধাসাধি করলেন। তবু সে যাবে। দিব্য তখন বাগানে গিয়ে সিগ্রেট টানছে। মধুমালা তাকে তার লাগানো গাছপালার সঙ্গে

পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। বাড়ির পশ্চিমে সেই কামিনীগাছের কাছে গিয়ে মধুমালা হঠাৎ লজ্জা পেয়ে মুখ নামায়। দিব্য মিটিমিটি হাসে।

—ওটা তোমার গাছ, জানতুম না!

—যারই হোক, গাছপালার ওতে অপমান হয়। ওদেরও তো প্রাণ আছে!

—আছে নাকি?

– তাও জানেন না? আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু আবিষ্কার করেছিলেন .....

দিব্য হো হো করে হাসে।—খুকু, তুমি রিয়্যালি খুকু। আচার্য বোসের আবিষ্কার অন্য।

—অন্য মানে?

—সায়েন্স নিয়ে কলেজে ভর্তি হয়ো। কেমন? সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে।

—ভ্যাট্! বাবা-মায়ের কন্‌স্‌পিরাসি চলছে, বললুম না।

—বললে নাকি? কখন?

—যান্! আপনার কিছু মনে থাকে না। ভেবেছিলুম....

—কী ভেবেছিলে, মধুমালা?

—তেমন কিছু হলে আপনার সাহায্য পাব।

—কী সাহায্য, কেমন সাহায্য, মধুমালা?

—জানি না। এমনি লেগেছিল।

—কিন্তু আমি তো এ্যাবস্কণ্ডার! ফেরারী খুনী আসামী!

মধুমালা মুখ তুলে ওকে একবার দেখে মুখটা নামায়। অন্তত এক মিনিট পরে মাথাটা একটু দুলিয়ে বলে— ভুলে যাই, মনে থাকে না!

দিব্য বলে—হ্যাঁ, আমারও।—

তখন প্রমথ নিজেই এগিয়ে দিতে যাচ্ছেন শান্ত বাবাজীকে। গেটে রিক্সা এসেছে। সুকুমার ছাদে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে। মন্দিরা নীচে

বাইরের চত্বরে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন। গেট থেকে রিক্সাটা চলে গেলে তিনি ঘুরে দাঁড়ান। দেখতে পান, বোগেনভিলিয়ার ঝোপের সামনে মধুমালা আর দিব্য দাঁড়িয়ে আছে। পিছনে লাল ও সাদা লক্ষ লক্ষ ফুল। চোখ জ্বলে যায় মন্দিরার। বুকটা ছাঁৎ করে ওঠে। ভাবেন, ডাকবেন খুকুকে—পারেন না। ভদ্রতায় বাধে। আস্তে আস্তে বাড়ি ঢুকে পড়েন। টানা বারান্দা ঘুরে ওপরে ছেলের ঘরে যান। তারপর ছাদে ছেলের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। বড়রাস্তায় দূরে রিক্সাটা সবে ঢুকছে। ট্রেনের আর দেরী নেই।

—সুকু! হাওয়া লাগবে, ঘরে আয়।

—যাই।

—সুকু!

—উঁ?

—ও কি সত্যি সত্যি থাকবে?

—কে? দিব্য? হ্যাঁ—বলছে তো থাকবে। থাক্ না।

—কিন্তু ছেলেটা ভাল নয় রে। তখন দেখেই কেমন লেগেছিল। তারপর জগা একটু আগে বলল, ওর কাছে পিস্তল আছে, তোরা ওর ঝোলা হাতড়ে বেব করেছিলি—সত্যি নাকি রে?

সুকুমার চমকে উঠেছিল। আস্তে বলে—জগা দেখেছিল? হ্যাঁ—আছে। আজকাল এইসব ব্যাপার হচ্ছে, মা। ছেড়ে দাও। স্টেনগান নিয়ে ঘুরে বেড়ায় ছেলেরা। আমাদের কী?

—কিন্তু খুকুর সঙ্গে ও যেন বড্ড বেশি মাখামাখি করছে।

—করুক না।

—না।

মায়ের কঠোর স্বব শুনে সুকুমার তাকায়। কিছু বলে না।

—ছেলেটা অসভ্য। তখন শুনলাম পুকুরে ল্যাংটো হয়ে চান করতে নেমেছিল। এঘাটে ওঘাটে বউ ঝিরা থাকে। হয়তো কতজনে

দেখেছে। কী বলবে তারা? গাঁ জুড়ে ঢি ঢি পড়বে না? তার ওপর ওই ছেলের সঙ্গে খুকু নাকি কপালীর জঙ্গলে ঘুরেছে। তুলে বউ দেখেছে। এতক্ষণ তো বাড়ি-বাড়ি খবর পাচার হয়ে গেছে। ওকে পষ্টাপষ্টি বলে দে—চলে যাক্।

সুকুমার কাঁচুমাচু মুখে বলে—ছি ছি! সে কি বলা যায় নাকি?

—তাহলে আমিই বলব।

—মা! না, না। দোহাই মা, লক্ষ্মিটি! এতে আমাকে অপমান করা হবে। হাজাব হলেও একসময় ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম। তাছাড়া—তুমি জানো না, তোমাদেব জানাইনি—অনেকবার ইউনিভার্সিটিতে অনেকের সঙ্গে ছাত্র ইউনিয়নেব ব্যাপাবে গণ্ডগোলে পড়েছি। দিব্য আমাব পিঠ বাঁচিয়েছে। ও না থাকলে আমার পড়াশোনাও হত না, হয়তো কবে মাব খেতুম।

মন্দিরা একটু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর আস্তে আস্তে চলে যান। সুকুমার মা-র চলে যাওয়া দেখে। তারপর তার মনে হয়, শীত-শীত ভাবটা বেড়ে যাচ্ছে একটু করে। জ্বরটা আবার আসছে। বিকেলের রোদ মিঠে লাগছে। সে ভাবে আরও কিছুক্ষণ রোদটা নেবে। পশ্চিমের কার্নিশে গিয়ে সে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। তারপর মুখ ঘোরাতেই চোখে পড়ে, নীচে বাগানে দিব্য আর খুকু দাঁড়িয়ে গল্প করছে। একবার দেখেই মুখ ফিরিয়ে নেয় সে। মনটা হঠাৎ দুঃখে ভরে যায়। বোনের নতুন ছোট্ট হৃদয়টার কথা ভেবে সে ছটফট করে ওঠে। এ কী করছে খুকু!

এবং সে আর দাঁড়াতে পারে না। ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। কাঁপতে কাঁপতে জড়ানো স্বরে ডাকে—....জগা! জগা! লেপ চাপিয়ে দিয়ে যা।....

॥ ছয় ॥

সুকুমারের জ্বর রাতের দিকে বেশ খানিকটা বেড়েছিল। জগন্নাথ ডাক্তার এসেছিলেন। বুকে ঠাণ্ডা জমে গেছে খুব। সকালে মধুমালার কাছে খবর পেল দিব্য।

সুকুমারকে কাল সন্ধ্যাবেলা মন্দিরা নীচের ঘরে নিয়ে গেছেন। নিজেই ছেলের দেখাশুনা করছেন। ওপরের ঘরে অবশ্য দিব্যের পরিচর্যার কোন ত্রুটি হয়নি। টানা একটা ঘুম দিয়েছে—স্বপ্নহীন ঘুম। খুব ভোরে উঠে খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে জীবনে এই প্রথম সূর্যোদয় দেখেছে। কতক্ষণ পরে মধুমালা চা নিয়ে এসেছে। দাদার অসুখের কথা বলেছে। তার ছোট্ট কপালে রাতারাতি যেন ভাঁজ পড়ে গেছে —যার নাম বিষাদরেখা।

চা খেয়ে দিব্য নীচে গেল সুকুমারকে দেখতে। মধুমালার সঙ্গেই গেল।

উঠোনে তখনও রোদ পড়েনি। ঘন ছায়ায় কী এক স্তব্ধতা আঁটো হয়ে আছে। টিউবেলের কাছে একরাশ বাসনকোশন ধোয়া হচ্ছে। দিব্যের মনে হল, ঝি মেয়েটি খুব সাবধানে ধোয়াপাথলার কাজটা করছে—যেন একটুও শব্দ ওঠে না। বেশ কয়েকজন লোক বাড়িতে এখন থাকা সত্ত্বেও এমন একটা প্রাতঃকালীন স্তব্ধতা কি সুকুর জ্বরের জন্যে, নাকি শান্ত চলে গেল বলে? কিংবা নাকি দিব্যের মতো অবাঞ্ছিত অতিথির দরুন? দিব্য তখনই স্থির করল, সে চলেই যাবে।

মন্দিরা দিব্যকে দেখে ঘোমটা দিলেন প্রাচীন রীতি অনুসারে এবং একটু সরে দাঁড়ালেন। দিব্য যথাসম্ভব সমীহ করে বলল - কেমন আছে ও।

মন্দিরা অস্ফুটস্বরে কিছু বলে বেরিয়ে গেলেন। দিব্য দেখল, সুকুমার কাত হয়ে ঘুমোচ্ছে। মুখটা তেলতেলে দেখাচ্ছে। দিব্য একবার ভাবল, ওর কপালে হাত রেখে উত্তাপ পরীক্ষা করবে। কিন্তু পাছে সুকুর ঘুম ভেঙে যায়, তাই একটু দাঁড়িয়ে থেকেই চলে এল।

মধুমালা ঘরে দাঁড়িয়ে রইল।

দিব্য ফিরে গেল ওপরের ঘরে। একটা সিগারেট ধরাল। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল বিছানার দিকে—যে বিছানায় সে শুয়েছিল। বালিশটা বিধ্বস্ত, আর চাদরও যথেষ্ট কুঁচকে বিশৃংখল হয়ে আছে। সে হঠাৎ অবাক হল। নিজেকে নিরুদ্বেগে গাঢ় ঘুমে স্থির কল্পনা করে তার অবাক লাগল। সে ঘুমোতে পেরেছিল এভাবে? এমন নির্বোধ ঘুমের কোন মানে হয়? নিজের ওপর তেঁতো হয়ে গেল সে। তারপর সিগারেটটা যত পুড়ে ছাই হল, অনুশোচনায় অস্থির হল সে।

যদি আগের সন্ধ্যায় কলকাতার একটা ছোট্ট বাড়িতে তার আঙুল ট্রিগারে চেপে না বসত, যদি সে মৃদু হেসে ক্ষমা করে চলে আসতে পারত, তাহলে আজ জীবনের এই অন্য দিগন্তে নির্বিবাদে চলে-ফিরে বেড়াতে পারত।

কতক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর সে ঝোলাটা টেনে নিল। কিন্তু উঠতে গিয়ে মনে হল, এ মুহূর্তে তার চলে যাবার জন্যেও যেটুকু সাহস ও সামর্থের দরকার, তা যেন নেই। সে যেন চুপিচুপি অন্যের ঘরে ঢুকে বসে আছে, পালাতে গেলে চোখে পড়ার ভয় আছে। আর সত্যি তো, কাকেও বিদায় সম্ভাষণ না করে যাওয়া ঠিক নয়। কেউ তাকে বিদায় দিতে এমুহূর্তে সামনে আসুক!

মধুমালা ছাড়া আর কে আসবে? সে এল একটা ট্রে নিয়ে। দিব্য দ্রুত দেখে নিল প্লেটে ফুলকো লুচি তরকারি দুটো সন্দেশ আর প্লেটচাপানো কাপে নিশ্চয় চা, এবং জলের গ্লাস। মধুমালা একমুহূর্তে

তার কাঁধে ব্যাগ দেখে নিয়ে কেমন হেসেছে।—ও কি! কাটবার চেষ্টা? এক্ষুনি কেন?

দিব্য চেষ্টা করে হাসল।—তাহলে কখন?

মধুমালা নীচু টেবিলে ট্রে রেখে শুধু বলল—আসুন।

—এখন আমার খিদে নেই, খুকু!

—কী বললেন? মধুমালা উজ্জ্বল মুখে ভুরু কুঁচকে তাকাল ওর দিকে।

—খুকু। তোমার ডাকনাম তো খুকু! সবাই যা বলে, আমি বললে দোষ হবে না নিশ্চয়।

মধুমালা মাথাটা দোলাল একটু। বলল—খেয়ে নিন। অত সাধাসাধি করতে হবে কেন?

দিব্য হাসতে-হাসতে বলল—নিশ্চয় নয়। জানলে তোমার মা রাগ করবেন।

—যাঃ! মা রাগ করবে কেন?....মধুমালা ভর্ৎসনার ভঙ্গীতে বলল কথাটা। কী ভেবেছেন মাকে? কাল থেকে দাদার জ্বর। একমাত্র ছেলের জ্বর হলে মায়েদের মনমেজাজ তো ভাল থাকে না। তাই আপনার সঙ্গে কথা বলল না। কই, খেয়ে নিন!

অগত্যা দিব্য সোফায় গিয়ে বসল। তারপর নির্বিকার মুখে একটা লুচি তুলে নিয়ে বলল—যাবার সময় তোমার খাতির! ট্রেনের টাইম জানা আছে তোমার?

—কেন?

—যাব।

—কোথায় যাবেন?

—কলকাতা। আবার কোথায়?

মধুমালা চমকে উঠল। চাপা তীব্র ঝাঁঝ ঝড়িয়ে বলল—কোনমুখে যাবেন? গেলেই তো পুলিশে হাতে হ্যাণ্ডকাপ লাগিয়ে দেবে। কী

করেছেন, সব ভুলে গেছেন বুঝি ?

হাসতে হাসতে কেসে ফেলল দিব্য। জল খেয়ে বলল—কলকাতা শহরটা খুব বড়। আশি লক্ষ লোক। সে তুমি ভেবো না, খুকু।

মধুমালা ঠোঁট উল্টে বলল—আমার ভাববার দায় পড়েছে! নেহাৎ সম্পর্কটা দাদার বন্ধু তাই।

দিব্য বুঝতে পারে, সুকুর বোন আবার বড্ড ছেলেমানুষী করছে। সেই ইঁচড়ে পাকামিটা আবার চেগে উঠেছে। কিন্তু সে হাসতে গিয়ে গম্ভীর হয়। বলে—তোমার পরামর্শটা কী তাহলে ?

-- কিসের ?

—বা রে! তুমি বলছ, কলকাতা ফিরে যাওয়া উচিত হবে না। তাহলে কোথায় যাব—কী করব ?

মধুমালা এতক্ষণ সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার সুকুমারের খাটে গিয়ে পা ঝুলিয়ে বসে। তারপব মিটিমিটি হাসে।—কাল আপনি বলছিলেন, কপালীর জঙ্গলে ঘুরে দিব্যি জীবন কাটিয়ে দেয়া যায়।

—হুঁ, বলেছিলুম!

—বলেছিলেন, শুধু চাই একটুকবো জমি।

—হুঁউ।

—চাষাভুষো হয়ে জলকাদা মেখে কাটাতে দারুণ লাগবে বলছিলেন!

দিব্যের খাওয়া শেষ। নিঃশব্দে জলের গ্লাস হাতে বাইরে ছাদে যায় এবং ড্রেনের মুখে হাত ধোয়। কুলকুচো করে। তারপর ফিরে এসে চায়ের কাপ তুলে নেয়।

মধুমালা বলে— জুড়িয়ে যায় নি তো ?

মাথা দোলায় দিব্য। তারপর বলে—ওসব বাজে। মানে কপালীর জঙ্গলটঙ্গল। কিন্তু তুমি হয়তো ঠিকই বলছ খুকু, যাবটা কোথায় ? ধরা আমি দেব না। কারণ, আমি বস্তুত কোন অন্যায় করিনি।

একজন ব্ল্যাকমেলার আমার জীবনকে হেল করে দিচ্ছিল, তাকে খতম করা পাপ নয়। তার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। সে কয়েকমুহূর্ত চুপ করে থাকে। তারপর নিজের যুক্তির দৃঢ়তা জানাতে আবার বলে—না, আমি ঠিকই করেছি।

মধুমালা আস্তে বলে—কিন্তু লোকটার বউ ছেলেমেয়ের কী হবে?

—এককথা কাল থেকে একশোবার বলছ খুকু।

—বলছিই তো। বলবও।

দিব্য তীব্র স্বরে কিন্তু চাপা গলায় বলে—লোকটা এমনি-এমনি মারা যেতে পারত। ট্রাম-বাসে চাপা পড়তে পারত। ষ্ট্রোকে মরতে পারত। ও একই কথা!

মধুমালার কপালে নাকের ডগায় ঘামের ফোঁটা জমে ওঠে। কী বলবে, কিছু খুঁজে পায় না। দিব্যের দিকে নিষ্পলক কয়েকমুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পর সে খাট থেকে ওঠে। ট্রে গুছিয়ে নিতে থাকে।

দিব্য বলে—তুমি রাগ করলে খুকু?

মধুমালা ঘাড় নাড়ে। তারপর বেরিয়ে যায়। দিব্য সিগারেট ধরায়। আবার ভাবনায় পড়ে যায়। সুকুর বোন তাকে থাকতে বলছে, এটা ঠিকই। কিন্তু কতদিন এভাবে অতিথি সেজে থাকা সম্ভব? ওদিকে শান্ত মনে-মনে ভীষণ চটে ফিরে গেছে। সে আজকালের মধ্যেই ব্যাপারটা টের পেয়ে যাবেই। তখন শান্ত কী করবে, বলা কঠিন। শান্তকে তার বরাবর আনপ্রেডিক্টেবল মনে হয়েছে। হ্যাঁ, শান্ত ঠিক এ রকম ছেলে। সুকুমারের কাছে বেড়াতে এসে হঠাৎ চলে যাওয়ার মধ্যে তার ওই স্বভাবটাই কাজ করছে।

সিঁড়ির মুখে দরজার পর্দার পিছন থেকে জগা ডাকে—বাবুদাদা!

—কী?

—দাদাবাবু খুজছেন আপনাকে।

—কে? সুকু?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

দিব্য ওঠে। ব্যাগটা নেবে ভাবে—তার আগে সুকুর পাজামা-পানজাবিটা খুলে নিজের পোষাক পরা দরকার, কিন্তু শেষঅব্দি ব্যাগটা রেখে নীচে যায় সে।.....

সুকুমার একগুচ্ছের বালিশে হেলান দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় রয়েছে। দিব্যকে দেখে মৃদু হাসে সে।—আয়!

দিব্য খাটে ওর পাশেই বসে। তারপর মাথায় আর গলার নীচে হাত রেখে বলে—জ্বর তো ছাড়েনি দেখছি!

—ভোগাবে দেখছি।....সুকুমার তারপর চাপা গলায় ফের বলে—একটা সিগারেট দে। মায়ের ঘরে এসে কী বিপদে পড়েছি! ওপরে থাকলে তোর অসুবিধে হত অবশ্য!

দিব্য সিগারেট বের করে। ওর ঠোঁটে গুঁজে দেয়।

সুকুমার ডাকে—খুকু! পর্দাটা টেনে দে না ভাই! আর মাকে একটু খানি ম্যানেজ কর।

দিব্য ঘুরে এবাব দেখতে পায় মধুমালাকে। আলনার সামনে দাঁড়িয়ে খুব কেজো ভঙ্গীতে সাড়ি গোছাচ্ছে। দাদার কথা শুনে সে ঘুরে বলে— সিগারেট টানলে মাথা ঘুরবে যে?

—মাথা আর কত ঘুরবে? তুই যা না লক্ষিটি। হুঁ, পর্দাটা...

মধুমালা রাগের ভঙ্গীতে চলে যায় এবং ইচ্ছে করেই পর্দাটা আরও ফাঁক করে দিয়ে যায়। সুকুমার বলে—সর্বনাশ! দিব্য!

দিব্য উঠে গিয়ে পর্দাটা টেনে দেয়। তারপর বলে—বরং দরজাটা বন্ধ করে দিই রে!

—তাই দে।

দরজা ভেজিয়ে সুকুমারের কাছে আসে দিব্য। সুকুমার চোঁ চোঁ করে সিগারেট টানে বিকৃত মুখে। তারপর কাসতে থাকে। জ্বলন্ত সিগারেটটা তার হাতে কাঁপে। কাসির মধ্যে ঘড় ঘড় করে বলে—

বাঁচবনা শালা !

দিব্য সিগারেটটা কেড়ে নেয়। জানলায় ঘষে নেভায় এবং বাইরে ফেলে দেয়। একটু বিব্রত বোধ করে সে। উদ্বিগ্ন হয়ে বলে—কী হয়েছে তোর ?

রুমালে মুখ মুছে সুকুমার একটু হাসে।— মৃত্যুরোগ ! রিয়্যালি— আই স্মেল ইট।

—আমাকে ট্রান্সফার করতে পারিস নে সুকু ? বিছানায় শুয়ে থাকি আণ্ড ওয়েট ফর....

—কেন রে ? ব্যর্থ প্রেমট্রেম ?

—কতকটা।

সুকুমারের মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। ক্রমশ সেই লাল আভা মিলিয়ে আবার ফিকে হলুদ রঙটা ফুটে ওঠে। সে দিব্যের একটা হাত খপ করে চেপে ধরে বলে—তুই বরাবর বড্ড মিসট্রিয়াস, দিব্য। তোর বিরাট অংশ আমি জানিনে, ওনলি এ লিট্‌ল ! বল্ না, কার সঙ্গে প্রেমটা জমিয়েছিলি এবং তারপর তার নিশ্চয়ই কোন বিগ গাইয়ের সঙ্গে বিয়ে হল। সব রাস্তাই তো রোমে যায় !

দিব্য বলে—অত কথা বললে সাফোকেশন হবে। চুপ করে থাক্।

—বল্ না রে ! শুনতে ইচ্ছে করছে।

—তোর হাতটা কী গরম ! থার্মোমিটার নেই ? টেম্পারেচার দেখা হয়েছে ?

—ছাড়্ ওসব। তুই বল্, দিব্য।

—কী বলব ?

—তোর ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী।

দিব্য একটু চুপ করে থাকার পর ওর দিকে তাকায়। মুখটা অস্বাভাবিক গম্ভীর। সুকুমার টের পেয়ে বলে—কী ?

—আচ্ছা সুকু,....বলে দিব্য থেমে থাকে।

—কী রে ?

—তুই হেমিংওয়ের কিলার গল্পটা পড়েছিস ? একটা লোক তার ঘাতকরা আসছে জেনেও চুপচাপ নির্বিকার শুয়ে রইল—পালিয়ে গেল না ! কারণ তার নিয়তি····

সুকুমার বাধা দিয়ে বলে—পড়েছি। কী বলতে চাস, তুই ?

—আচ্ছা সুকু····

—কী রে ?

—এমন যদি হয়, আমি তোর কাছে লুকিয়ে থাকতে এসেছি—ধর, আমি তোকে বলছি, আই অ্যাম আসকিং ফর এ্যান আনডার-গ্রাউনড্-লাইফ ···

—তার মানে ? সুকুমার উত্তেজনা চাপে। তুই কি আবার সেই পলিটিকসে নেমেছিস ?

ঘাড় নাড়ে দিব্য।—না। তার জেরহিসেবে একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটেছে। সুকু, তুই কীভাবে নিবি ব্যাপারটা, জানি না। খুকু অবশ্যি শুনেছে এবং হয়তো মেনে নিয়েছে।

সুকুমার চমকে উঠল।—খুকুকে বলেছিস ? কেন বলতে গেলি ওকে ? ভ্যাট্ ! ও পেট-আলগা মেয়ে—নেহাৎ বাচ্চা ! ভুল করেছিস রে।····সুকুমার একটু চুপ করে থাকার পর ফের বলে—কিন্তু কী ? ব্যাপারটা কী ?

—পরশু সন্ধ্যায় আমি একটা মার্ডার করেছি। তাই শান্তর সঙ্গে তোর এখানে পালিয়ে এসেছি।

সুকুমার নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলতে ভুলে যায় যেন।

দিব্য বলে—অন্যায় করিনি। লোকটা ছিল ব্ল্যাকমেলার। আমার আগের লাইফের কিছু ইনফরমেশন আর ডকুমেণ্ট ছিল ওর হাতে। আমি চেয়েছিলুম অন্যরকম ভাবে বাঁচতে। বাস্টার্ড ব্ল্যাকমেলার

আমাকে ফতুর করে দিচ্ছিল না শুধু—প্রতিমুহূর্তে অস্বস্তির সৃষ্টি করছিল। তাই ওকে পরশু সন্ধ্যায় ওর বাড়িতে গিয়ে ওর বউ-ছেলেমেয়ের সামনে ..দিব্য দুহাতে মুখ ঢেকে একটু ঝুঁকে পড়ে।

সুকুমার তার পিঠে হাত রেখে ডাকে—দিব্য, শোন।

— বল!

—শান্ত জানে?

—না।

—খুকু ছাড়া আর কেউ জানে?

—না।

—খুকুকে কেন বলতে গেলি?

মুখ তুলে মাথা দোলায় দিব্য।— জানিনে। কপালীর জঙ্গলে তোর বোন গেল। পোড়া মন্দিরটার ওখানে গিয়ে সম্ভবত কান্নাকাটি করছিল।....

—খুকু? কেন?

দিব্য হাসে একটু।—শান্তর সঙ্গে বিয়ের কথা শুনে বেচারা ঘাবড়ে গিয়েছিল। আমি....জানি না কেন, হঠাৎ ওর কাছে কনফেশানের ঝোঁকে গলে পড়লুম। তুই বিশ্বাস কর সুকু। আমি হঠাৎ খুব এলোমেলো হয়ে পড়েছিলুম?

সুকুমার বলে—দেখ তো, কোথায় জলের গ্লাস আছে।

পাশের টেবিল থেকে জলের গ্লাসটা তুলে দেয় দিব্য। সুকুমার কয়েক চুমুক জল খেয়ে বলে—রেখে দে। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে বারবার।

দিব্য গ্লাসটা রেখে বলে—যাক্‌গে ওসব। আমি চলে যাই, সুকু।

—কোথায় যাবি? কলকাতায় ফেরা মোটেও উচিত হবে না তোর।....সুকুমার একটু ভেবে নেয় দ্রুত।....দূরে কোথাও আত্মীয়স্বজন থাকলে বেটার। কিন্তু....সত্যি দিব্য, আমি ভাবতেও পারিনি তুই

মার্ডার করে চলে এসেছিস। কাল শান্ত তোর রিভলবারটা বের করল। তখনও ভাবিনি।

—আমি যাই রে!

সুকুমার ওর হাত টেনে ধরে।—শোন্। দ্রুত এভাবে ডিসিশন নেওয়া ঠিক নয়। একটা কথা বলছি তোকে—মন দিয়ে শোন। কপালীতলায় আমাদের ফ্যামিলি, তোকে আগেও বলেছি, দুর্গের মতো নিরাপদ জায়গা। কেন জানিস? বাবার প্রভাব-প্রতিপত্তি। অন্তত এটুকু বলতে পারি, এখান থেকে তোর কোন ক্ষতি হবে না, যতক্ষণ বাবা আছেন। তাছাড়া কলকাতা থেকে জায়গাটা বেশ দূরে। আগের মতো এঁদো পাড়াগাঁ নয় যে সবাই তোর গতিবিধি মুখস্থ করে ফেলবে। বাইরের লোক সম্পর্কে আজকাল এখানে আর কেউ কৌতূহল দেখায় না। কাজেই এখানে আপাতত তুই সেইফ।

—তারপর?

- কয়েকটা দিন যাক্। তারপর ডিসিশন নিবি।

দিব্য চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে—কিন্তু আমি তো জানি—তুইও জানিস, সারাজীবন এভাবে লুকিয়ে থাকার মানে হয় না। হয়তো লুকিয়ে থাকাও যায় না!

—হুঁ। যায় না। সেজন্যই বলছি, নিজেও ভাব্, আমাকেও ভাবতে দে।...বলে সুকুমার কণ্ঠস্বর চাপা করে।—বরং শোন্। বাবার সঙ্গে কনসাল্ট করি। না না—উনি এসব ব্যাপারে নির্বিকার, দেখবি। জীবনে রাজ্যের মার্ডারকেস ঘেঁটেছেন। ডাল-ভাতের ব্যাপার।

দিব্য তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। এইসময় বাইরে দরজায় চাপ পড়ে। মন্দিরার গলা শোনা যায়।—সুকু! ও সুকু! দরজা দিলি কেন? ওষুধ খাবার সময় হল যে!

দিব্য উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেয়। মন্দিরা ঢুকে ওকে দেখে কেমন হাসেন। তারপর সোজা ছেলের দিকে পা বাড়ান।—ওষুধ খেতে হবে যে!

—মা! দিব্যকে যেতে দিও না। ও চলে যাবে, বলছে!

মন্দিরা ঘুরে আবার দিব্যকে দেখে নিয়ে বলেন—না। যাবে কেন? আমরা তো তাড়িয়ে দিচ্ছিনে বাবা! উনি মদনের কাছে তোমার বন্দুকের টিপের কথা শুনে খুব খুশি। মানে—সুকুর বাবা। একটু আগে বলছিলেন, ছেলের সঙ্গে তাহলে আলাপ করতে হয়। তুমি যাও না বাবা, বাইরের ঘরে একা আছেন।

সুকুমার হেসে ওঠে।—এক শিকারী আরেক শিকারীর খোঁজ পেয়ে গেছে। আবার কী!

দিব্য বেরিয়ে যায়।—

প্রমথ দাদার ওপর রেগে গুম হয়েছেন সকাল থেকে। রোজ টুম্পাকে নিয়ে এবাড়ির বাগানে কিছুক্ষণ ঘোরেন। আজ সাধনবাবু মুখের ওপর বলে দিয়েছেন—টুম্পা ঘুমোচ্ছে। অথচ খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে টুম্পার হাসি শুনেছেন। বাকিটা বলেছে, ও বাড়ির ঝি। ছোটকত্তার কানে ইনিয়ে-বিনিয়ে দাম্পত্য-কলহের বর্ণনা তুলেছে। প্রমথ স্তম্ভিত হয়েছেন। সহোদর ভাই! মানুষ কী, এ-বয়সেও চেনা গেল না তাহলে।

ফিরে এসে বন্দুক নিয়ে বসেছেন। তেল দিয়ে মুছেছেন—কার্তুজের হিসেব করেছেন। তারপর ভেবেছেন, প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করা যাক্। সেই কবে ঝোঁকের মুখে বন্দুক ছোঁবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এ্যাদ্দিনে তা পচে ভূত হয়ে গেছে।

প্রমথ এখনও বিড়ি টানেন। পর্দা তুলে দিব্য বাইরের ঘরে ঢুকে

দেখল, সুকুর বাবা বিড়ি টানছেন। তাকে দেখে খুশি হয়ে বললেন —এই যে! এস—এস। বসো। একটু আগে তোমার কথাই হচ্ছিল। তোমার নামটা কী যেন বাবা?

দিব্য সামনে সোফায় বসে বলে—দিব্যেন্দু চক্রবর্তী। দিব্য বলে ডাকবেন।

—হুঁ। তোমার হাতে তো প্রচণ্ড টিপ! বন্দুক আছে নিজের?

—এখন নেই। ছিল। রাইফেল ছিল।

বল কী! প্রমথ প্রশংসাসূচক কটাক্ষ করলেন। কী হল রাইফেল?

—গণ্ডগোলের সময় পুলিশ নিয়ে যায়। আর ফেরত দেয়নি।

—ক্লেম সাবমিট করোনি পরে? কিসের গণ্ডগোল?

দিব্য একটু হেসে বলে—পলিটিক্যাল। সিক্সটি সেভেনের ব্যাপার।

—তাই বলো! প্রমথ খুকখুক করে হাসলেন। এ্যারেষ্ট হয়েছিলে?

—হ্যাঁ। পরে ছেড়ে দেয়।

—তুমি তো ওস্তাদ ছেলে তাহলে! হুঁ—দেখেই আঁচ করেছিলুম।...বলে প্রমথ ঘাড় ঘুরিয়ে ডাকেন—মদন! এ্যাই মদ্না!

বাইরের উঁচু বারান্দা থেকে সাড়া আসে—আজ্ঞে-এ-এ!

—এদিকে আয়।

মদন সবিনয়ে ঢোকে। দিব্যকে দেখতে পেয়ে একগাল হেসে সে মাথা নুইয়ে করযোড়ে প্রণাম করে। তারপর বলে—আজ যাবেন তো আজ্ঞে?

প্রমথ কপট ধমক দেন—ইস্! লোভ বেড়ে গেছে রে! যা, দু'কাপ চা নিয়ে আয়।

মদন চলে গেলে দিব্য বলে—শিকারে মদন দারুণ কাজের লোক। ট্র্যাকার হিসেবে ভালই। তবে বাঘ-ভাল্লুক তো নেই আপনাদের দেশে!

—ছিল। প্রচুর ছিল। প্রমথ স্মৃতিভারাক্রান্ত কণ্ঠস্বরে বলেন। ....একসময় আমার গোয়াল-ঘর থেকে বাঘ বাছুর নিয়ে যেত। এখনও যে দু'একটা নেই, এমন নয়। তুমি তো নদীর সাউথে মানে বাঁওরের ওদিকে যাও নি! খুব জঙ্গল আছে এখনও। বাঁধ হয়নি কি না। হলে - সবটা উচ্ছেদ হবে। তাই আমি চেষ্টা করছি, বরং যাতে বাঁধটা না হয়। ওটা সরকারী রিজার্ভ ফরেষ্ট হতে আপত্তি কী? কালেকটার সায়েব কন্‌ভিন্সড্। কিন্তু চাষা-ভূষোদের জমিব খাকতি প্রচণ্ড। তাদের নিয়ে পলিটিকস চলছে। বড্ড ঝামেলা বাবা, বড্ড ট্রাবল!...

প্রমথ একটু চুপ করে থেকে ফের বলেন—এত তিনগুণ-চারগুণ ফসল বেড়েও তো লোকের পেট ভরছে না। ভরবে কী ভাবে? কুকুর-বেড়ালের মতো বাড়ছে লোকসংখ্যা। আমি বলি, লোকসংখ্যা কমাও। আর জঙ্গল উচ্ছেদ বন্ধ করো। মানুষও বাঁচুক, জীবজন্তুও বাঁচুক। পৃথিবীতে শুধু মানুষই থাকবে, তাহলে বৈচিত্র্য কোথায়! শুধু খাবে-দাবে, পরবে, আর স্ফূর্তি করবে? কোন মানে হয়? ঈশ্বর কত বৈচিত্র্য সাজিয়ে রেখেছিলেন থরে-বিথরে। নির্বোধের মতো সব চষে একাকার করে জমি আর কারখানা বানাচ্ছ। বোকার হদ্দ আর কাকে বলে!

দিব্য সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। এই মানুষটিকে সে কী ভেবেছিল? সে মুগ্ধ হয়ে বলে—আপনি ঠিকই বলেছেন জ্যাঠামশাই।

সায় পেয়ে প্রমথ বলে - বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নিয়েছি। আর আমিষ ছুঁইনে। প্রতিজ্ঞা তো তারও আগে করেছিলুম, বন্দুক ধরব

না। তো...

—শুনেছি। মদন বলছিল।

প্রমথ কাঁচুমাচু হাসেন।—হঠাৎ তোমার গল্প শুনলুম মদনের কাছে। তারপর আনকনশাসলি বন্দুক সাফ করতে বসলুম। বৈষ্ণবের অহিংসাধর্ম মেইনটেইন করা আমার মতো ত্যাঁদোড় লোকের পক্ষে বড় কঠিন। বলবে ত্যাঁদোড় কেন বলছি? বাবা, সারাজীবন মোক্তারি করে ক্রিমিনাল ঘেঁটেছি। ফৌজদারি কেস মানেই রাজ্যের মারদাঙ্গা খুনখারাবি—তোমার গিয়ে রেপকেস চুরিডাকাতি, বাটপাড়ি।.... ওতেই ভেতরটা কেমন যেন হয়ে গেছে। এই বৈষ্ণবের বুকের ভেতরটা যদি দেখতে।

একি কনফেশান? দিব্য অবাক হয়ে যায়। আর প্রমথ তখনই নিজেকে সামলে নেন। বলেন— এটাই এক জ্বালা। গুরুতর সমস্যা। মাঝে মাঝে দুর্দান্ত বন্য এক পুরনো প্রমথ অহিংস ভালমানুষ এই প্রমথকে দাবিয়ে রেখে বেরিয়ে আসতে চায়।

মদন চা নিয়ে আসে। টেবিলে রেখে একটু তফাতে বসে। প্রমথ বলেন—আহারাদি হয়েছে তো বাবা? নাও, চা খাও।

দিব্য চায়ে চুমুক দিয়ে বলে—আপনার বন্দুকটা খুবই ভাল। একটু হেভি অবশ্য। পাখিটাখি মারার পক্ষে অসুবিধে—কিন্তু বড় কিছু মারার পক্ষে খুব কাজের জিনিস।

প্রমথ বন্দুকটায় হাত বুলিয়ে বলেন—বিলিতি যে! সেকেণ্ডহ্যাণ্ড কিনেছিলুম। সদরে তখন সাবজজ ছিলেন ম্যাকফারসন সায়েব। যাবার সময় বেচে দিলেন। লাইসেন্স করা ছিল অলরেডি। নাইনটিন থার্টি নাইনে। তখন সেকেণ্ড গ্রেটওয়ার শুরু হয়েছে। ওয়ার-ফাণ্ডে মোটা চাঁদা দিয়ে লাইসেন্স হাতালুম।....যাক্‌গে। তোমার কথা বল এবারে। বাবা-মা বেঁচে আছেন তো?

দিব্য ঘাড় নাড়ে।—বাবা নেই। মা আছেন। দাদারা আছেন।

—কলকাতায় আছেন ?

—কলকাতায় আমি একা। দাদারা বাইরে থাকেন। মা তাঁদের কাছে।

—তাই বুঝি!...প্রমথ সস্নেহে ওকে দেখার পর ফের বলেন—ইয়ে, নিজের বাড়ি আছে, না ভাড়াবাড়ি ?

—একটা সিঙ্গলরুম ফ্ল্যাট! ভাড়া দিয়ে থাকি। গরচার দিকে।

—আচ্ছা! প্রথম চাটুকু গিলে কাপ মদনের দিকে এগিয়ে দেন। যা, রেখে আয়। দেখে ফেলবে কেউ। যা বাড়ি হয়েছে! ইয়ে, শোন—বল্‌গে, আমি সুকুর বন্ধুকে নিয়ে বেরোচ্ছি।

মদন দাঁত বের করে বলে—আমিও যাব আজ্ঞে!

প্রমথ ধমক দেন।—না।

মদন বিরস মুখে কাপছুটো রাখতে যায়। দিব্য বলে—একমিনিট। কাপড়টা বদলে আসি।

কী দরকার ?। হ্যাঁ, শোন বাবা, বন্দুক আমি ছুড়ব না। প্রকাশ্যে হাতে নিতেও পারব না। লোকে তুষবে। আফটার অল বয়স তো হয়েছে। আমি তোমার টিপ দেখব।

দিব্য হাসিমুখে বলে—ঠিক আছে।....

মদনের কাছে শুনে মন্দিরা থ। বন্দুক নিজের হাতে সাফ করেন প্রমথ, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু তাই বলে বন্দুক নিয়ে বেরোবেন ফের, এটা অকল্পনীয়। ছি ছি! লোকে কী বলবে! সুকুমার বলল—না, না। দিব্য বন্দুক ছুড়বে। বাবা হয়তো ওয়াচ করবেন!....

মধুমালা শুনেই বাইরের ঘরে যখন গেল, তখন দিব্য আর প্রমথ গেট পেরিয়ে রাস্তায় নেমেছেন। সে ফিরে এসে সটান ছাদে

চলে গেল।

ছাদ থেকে কপালী নদীর ওপারঅব্দি দেখা যায়। সে দেখল, দুই মূর্তি হনহন করে চলেছে। বাবাকে আজ খুব চঞ্চল মনে হচ্ছে। তার এত ভাল লাগল দৃশ্যটা!

কিছুক্ষণ রোদে দাঁড়িয়ে সে ঘেমে উঠল। কখন দুজনে নদী পেরিয়ে ওপরে উঠেছে। মধুমালা চঞ্চল হয়ে উঠল।

সিঁড়ি দিয়ে প্রায় দৌড়ে নেমে যায় সে। মন্দিরা বলেন—কোথা যাচ্ছিস খুকু? দাদার কাছে থাক্ গে। মাথা ধরেছে বলছিল।....

মধুমালা কান পাতে না। বেরিয়ে যায়।....

ওপারে বাঁধে দাঁড়িয়ে প্রমথ মদনের মতো নিসর্গের নামতাপাঠ শুরু করেছেন তখন। ধুতি এমনভাবে কোমরে গুঁজেছেন, হাঁটু অব্দি নগ্ন হয়েছে এবং কোথাও লোম নেই দেখে দিব্যের অবাক লাগে। পায়ে চটিজুতোয় নদীব বালি ঢুকেছিল। পা ঝেড়ে নিতে দিব্য চমকে ওঠে। ডানপায়ের তিনটে আঙুল নেই। দিব্য তাকিয়ে আছে দেখে প্রমথ অন্যমনস্কভাবে বলেন—একসময় কপালী নদীতে বড্ড কুমীরের উপদ্রব ছিল। বর্ষায় সাঁতরে এপারে আসতুম। একবার ধরে ফেলল! শেষঅব্দি পায়ের আঙুলের ওপর দিয়েই গেল। তখন সদরে কালেকটর ছিলেন এক আইরিশ সায়েব। কুমীরটার অত্যাচার বাড়লে একদিন চলে এলেন।

থামতে দেখে দিব্য বলল—মারলেন কুমীরটা?

– হ্যাঃ।...প্রমথ ফতুয়া থেকে বিড়ি বের করে ধরান। তারপর পা বাড়ান। ফের বলেন—এখন মরুভূমির অবস্থা। কোন জন্তু-জানোয়ার দেখি না। কোন থ্রিল নেই!

একটু পরে খুকখুক করে হেসে বলেন—জন্তুজানোয়ার নেই নয়,

আছে। সেগুলো মানুষ হয়ে ভোল পাল্টেছে এখন। মানুষের চেহারা নিয়ে সমাজে ঢুকে পড়েছে। তাই না?

দিব্য ছোট্ট করে সায় দেয়।

—বাঘের হিংস্রতা, সাপের খলতা, শেয়ালের ধূর্ততা, শুওরের গোঁ, সবই তুমি দেখতে পাবে মানুষের মধ্যে। আগে এতটা ছিল না।

তিনটে আঙুল নেই, অথচ প্রমথ একটুও খুঁড়িয়ে হাঁটেন না। রোদ আর ছায়া ওঁর মুখের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, আর মুখটা দেখে মনে হচ্ছে, এই পৃথিবীর অনেক স্মৃতির ছোপ-ধরা তামাটে পোড়-খাওয়া একটা অদ্ভুত পদার্থ, যা পাথরের মতো -অথচ প্রাণবন্ত, চঞ্চল, সারাক্ষণ ব্যস্ত। কপালীর জঙ্গলে ঢুকেই মানুষটা বদলে গেছেন। কিন্তু কোথায় যাচ্ছেন দিব্য কিছু বুঝতে পারে না। খালি মনে হয়, নিসর্গের কোন গোপন নির্জন আর রহস্যময় অভ্যন্তরে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অকারণে তার গা ছমছম করে।

একটা বিশাল গাবগাছের তলায় পৌঁছে প্রমথ হঠাৎ ঘোষণা করেন—একবার আমি এই বন্দুকে মানুষ মেরেছিলুম!

দিব্য কথাটা পরিহাস কিনা বুঝতে চেষ্টা করে। কিন্তু প্রমথের মুখের রেখায় দৃঢ়তা ফুটে উটেছে। গলার নীচের খাঁজে ঘাম চকচক করছে। দুচোখের ঘোলাটে ফ্যাকাসে মাংসে দুটো তারা পিঙ্গল, আর তারার কেন্দ্রবিন্দুতে ঠিকরে পড়ছে কী আলোর ঝলকানি। দিব্য বলে—আজ্ঞে?

—মানুষকে গুলি করেছিলুম। ওই ঝোপগুলো দেখছ, ওর পিছনে একটা জলা আছে, সেখানে।

দিব্য আস্তে বলে—কেন?

—জাস্ট চোখের ভুল। ইচ্ছে করে—ডেলিবারেটলি গুলি করিনি। তখন এই এলাকায় বুনো শুওরের খুব উপদ্রব ছিল। ভয়ে লোকেরা চাষবাস বা কাশখড় কাটতে যেতে পারছিল না। তখন সবাই আমাকে

ধরল—মোক্তার বাবু, এর একটা ব্যবস্থা না করলে আমরা না খেয়ে মরব। তাই বেরিয়ে পড়লুম। সারাদিন টোটো করে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছি। সূর্য নদীব ওপাবে সবে ডুবেছে। হঠাৎ দেখি, ওই ঝোপগুলোব পিছনে কী নডাচড়া করছে। আবছা অন্ধকারে কালো চাবপাযে হাঁটা জন্তু—শুওর ছাড়া কী হতে পারে? গুলি করলুম। গোঙানিও শুনলুম। অবিকল শুওরের চিৎকাব। তাবপর নডাচড়া থামলে এগিয়ে গিয়ে সাবধানে টর্চের আলো ফেললুম। দেখলুম…

—মানুষ?

—মানুষ।

—কে?

—বাউরিদের একটি ছেলে। বছর ষোল-সতের বয়স। লুকিয়ে কাশখড় কাটছিল। ওই কাশবনগুলো ইজারাদারের সম্পত্তি। ছেলেটা লুকিয়ে খড় কাটতে এসে মারা পডল।

—কী করব? বডিটা তুলে নিয়ে বিলের জলে দামের তলায় রেখে দিলুম। বাড়ি ফিরে মদনকে ডেকে নিয়ে এলুম। একখানে গভীব গর্ত করে পুঁতে ফেলা হল। তারওপর ঘাস আর কাশের ঝোপ চাবড়াসুদ্ধু তুলে বসিয়ে স্বাভাবিক করে দেওয়া হল। সেবারই বর্ষায় ফ্লাডে একাকার হল। এখন ওখানটায় ধানচাষ হচ্ছে। কোন চিহ্ন নেই।

—খোঁজ হল না ছেলেটির?

—হয়েছিল। এলাকার লোকেরা তখন বড্ড সরল আর বোকা-সোকা ছিল। বিলের জলে পরীদের পাতালপুরীর কথা বিশ্বাস করা হত। অনেকে এখনও ভাবে, ছেলেটাকে পরীরা সেখানে নিয়ে গেছে। বেঁচেবর্তে সুখেস্বচ্ছন্দে আছে। পরী বিয়ে করে ছেলেপুলের বাপও হয়ে থাকবে।

প্রমথ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে অদ্ভুত হাসেন। দিব্য বলে—শুধু এই ?

প্রমথ ঘাড় নাড়েন।—না। একটা মাঠকুড়োনি মেয়ে বাড়ি ফেরার পথে আড়াল থেকে ব্যাপারটা দেখেছিল। সে আমার ভয়ে কিছু বলেনি। পরে আমার দিকে কেমনদৃষ্টে চেয়ে থাকত। এইতে আমার সন্দেহ হল। তখন ওকে জেরা শুরু করলুম। ভয়ে মেয়েটা কেঁদেকেটে অস্থির। শুধু বলে—কাকেও বলিনি মোক্তারবাবু..... কাকেও বলবনা মোক্তাববাবু....এইরকম প্রলাপ। তখন গতিক বুঝে....

দিব্য শুকনো গলায় বলে—কী ?

প্রমথ নিজের করতল ও আঙুল দেখতে দেখতে অস্ফুট বলেন—আমার অনেক পাপ—অনেক! তারপর মাথা দোলান। কোন দুর্জ্ঞেয় ভাবের প্রকাশ যেন।

দিব্য অস্থির হয়ে বলে—মেয়েটির কী হল ? কী হল তার ?

প্রমথ মুখ তোলেন। গাছের উঁচুতে দৃষ্টি রেখে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। একটা ঝিঁঝি পোকা তীব্র স্বরে একটানা ডাকছে। একটু পরে বলেন—উঠোনের নিমগাছে সে একরাতে স্যুইসাইড করে ঝুলেছিল।

দিব্য শ্বাসপ্রশ্বাস মিশিয়ে বলে—খুন করে ঝুলিয়ে দিলেন বুঝি ?

—সবাই তাই তো করে।....প্রমথ ওর দিকে ঘুরে কেমন হেসে বলেন।

—করে বুঝি ?

—হুঁউ। যেমন তুমি করেছ। প্রমথ এবার পরিষ্কার হাসেন।

—কে বলল আপনাকে ?

প্রমথ মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে জবান দেন—খুকু। আর সেজন্যেই এভাবে তোমায় ডেকে নিয়ে এলুম।....

॥ আট ॥

কিছুক্ষণ আগে কপালীর জঙ্গলে যে কুঁচফলের ঝোপ দিব্যের জামা একবার টেনে ধরেছিল এবং দিব্য ঘুরে দাঁড়িয়ে যার দিকে তাকাতেই জামা ছেড়ে দিয়েছিল—যেন ভয় খেয়েই, সেই ঝোপটা মধুমালার আঁচলের একটা টুকরো নিল।

মধুমালা ঘুরে দেখল একবার। এই গ্রীষ্মে লাল কুঁচফল ধরেছে থোকায়-থোকায়। ক্ষয়া-খর্বুটে গুল্মটির সারা গা ফেটে রক্তারক্তি যেন। নাড়াবুনে বোকার মতো তাকিয়ে তার মাথার ওপর এক লম্বাটে বালক অর্জুন গাছ ভয়ে কাঁপছে। আর পতপত করে পতাকার মতো উড়ছে একটা সাপের খোলস পাশের শেয়াকুল ঝোপে। তার গা ঘেষে আবার এক শান্ত সন্ন্যাসীর মতো দাঁড়িয়ে আছে সাঁইবাবলার ঝাড়—জটার মতো ঝুলছে তার মাথা থেকে বুনো-আলু আর শিমলতা, তার গোঁফদাড়ির মতো চিকন সোমলতার ঝালর—যার ওপর বনচড়ুইয়ের ঝাঁক এতক্ষণ খুব হইচই করছিল এবং মধুমালাকে দেখেই ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। সন্ন্যাসী সাঁইবাবলা অমনি রুষ্ট দৃষ্টিপাতে মধুমালাকে ভস্ম করতে চাইল। মধুমালা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার অবচেতনায় হাজার বছরের মেয়েদের সেই ব্যকুলতা জেগে উঠেছে, যে-ব্যকুলতায় বীজ থেকে গাছের অঙ্কুর গজায়, কলি থেকে ফুল ফোটে এবং ফুল থেকে ফল ধরে—আর মেঘ থেকে বৃষ্টি ঝরে, সূর্য ওঠে এবং অস্ত যায়, দিন ও রাতের কত খেলা চলে পৃথিবীতে!....

দিব্য আর প্রমথ আজ জামবনে ঢুকছেন। ঘন ছায়ার মধ্যে ছুটি

মানুষকে দেখে ভারি অবাক লাগে। আর দিব্যের উজ্জ্বল সাদা মুখ এদিকে ওদিকে ঘুরছে। প্রতিবারই মধুমালা ভাবছে, তাকে সে দেখতে পাবে। কিন্তু দিব্যের দৃষ্টিতে একটা ব্যাপ্তি আছে, যা দূরের কিছু ছুঁয়ে বেড়াচ্ছে। গাছের পাতার ফাঁকে আকাশের নীল—নাকি ধূসর কাশবন? মধুমালার বড় অভিমান হয়। তাকে পিছনে ফেলে রেখে ওরা কতদূরে চলে গেল! তারা তো একই দলের মানুষ। যেন কথা ছিল দলবেঁধে কোথাও বেরিয়ে পড়ার এবং হেঁটে যাওয়ার—কত নদী মাঠ বনভূমি পেরিয়ে আদিম থেকে আদিমতম জগতে—প্রকৃতির জঠরের দিকেই বা—যেখানে সারাক্ষণ স্যাঁতসেতে উর্বর মাটি থেকে জন্ম নেয় এ্যামিবা ও শামুক, পাখি ও সিংহের পাল,—পড়ে আছে সেখানে নিষ্পিষ্ট শ্যাওলা আর ছত্রাক, আর ফার্ন, ভাঙা ডিমের খোল, স্তব্ধ রঙচঙে গিরগিটি আর চিত্রিত সুন্দর সাপ কুণ্ডলীপাকিয়ে। সে বড় রহস্যময় গভীরতম উৎসপ্রদেশ। বুকে হেঁটে সেখানে সরীসৃপের ভিড়ে মিশে মানুষকে ঢুকে যেতে হয়—পুরো ন্যাংটো হয়েই, সভ্যতার খোলসে বাইরের দরজায় ফেলে ও পা দিয়ে মাড়িয়ে ঢুকতে হয় সেই গোপন নির্জন পাতালে।...

এইসব কথা আবছা মনে হয়েছে অনেকদিন থেকে মধুমালার। বড় অস্পষ্ট আর ভাসা ভাসা স্বপ্নের মতো এই বোধ। তার মনে হয়েছে, ওইরকম কোন একটা জায়গা থেকেই উদ্ভিদ মানুষ ও প্রাণীদের আসা এবং মৃত্যু মানে সেখানেই ফিরে যাওয়া।

এখন কপালীর জঙ্গলে দাঁড়িয়ে মধুমালাকে সেই অদ্ভুত বোধ বিব্রত করে। আকাশের রঙ এখন ক্রমশ নীল থেকে ধূসর হয়ে পড়ছে। রোদ হচ্ছে আরও ঝাঁঝালো। হাল্কা বাতাস ছায়ায় এসে সেই ঝাঁঝ ছড়িয়ে দিচ্ছে। বুকের মধ্যিখানে ঘামের সিক্ততা টের পায় সে। তার চোখদুটো স্থির আর নিষ্পলক হয়ে ওঠে। প্রমথ দিব্যের কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে কিছু বলছেন দেখতে পায়। তারপর ওরা আবার

পা বাড়ায়। তখন মধুমালাও ঝোপের আড়ালে অনুসরণ করে।....

জামবনের শেষে বাঁওরের বিস্তীর্ণ জলা। দুটি মানুষ এবার সেই জলার ধারে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। মধুমালা হঠাৎ ডাইনে পায়ের শব্দ পায়। শুকনো পাতার ওপর ভারি পায়ের শব্দ। সে সঙ্গে সঙ্গে গাছের আড়ালে বসে পড়ে। মদন হন্তদন্ত এগোচ্ছে। প্রমথকে কোন খবর দিতে যাচ্ছে নিশ্চয়। কী খবর? দিব্যের ব্যাপারে নয় তো? এতক্ষণে কি পুলিশ দিব্যের খোঁজে-খোঁজে কপালীতলার মোক্তারবাড়ি চলে এসেছে? মধুমালার বুক ঢিপঢিপ করে।

কিন্তু সে সাড়া দেবার আগেই মদন বাঁধের রাস্তায় অনেকটা এগিয়ে গেছে।

মদন প্রমথেব কাছাকাছি হতেই প্রমথ ঘোরেন। এতদূর থেকে বোঝা যায়, মদন ধমক খাচ্ছে। তারপর কিন্তু প্রমথ দিব্যকে কিছু বলেন। দিব্য বন্দুক কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রমথ আর মদন বাঁধের রাস্তায় ফিরে আসছেন।

অমনি মধুমালা কাঠবেড়ালির ক্ষিপ্রতায় জামবনের পূর্বদিকে হামাগুড়ি দিয়ে সরে যায়। এই গাছগুলো বুনোজামের। মাটি থেকে সমানে ঝাঁকড়া হয়ে উঠে গেছে। সরু কাণ্ড ও ডালপালা। কিন্তু ঘন পাতায় ঢাকা। পূর্বদিক ঘুরে মধুমালা দিব্যের কাছাকাছি গিয়ে একটু হাসে। দিব্য বন্দুক তাক করেছে জলার ওপর একটা শঙ্খ-চিলের দিকে।

সেই সময় পা টিপে-টিপে পেছন থেকে এগিয়ে মধুমালা খপ করে দুহাতে দিব্যের দুচোখ চেপে ধরে। দিব্য বলে—ছাড়ো মধুমালা!

মধুমালা একচোট হাসে প্রাণ খুলে। তারপর বলে—অন্য কেউ হতে পারত!

—আর কে হবে?

—অন্য কেউ হতে পারেনা বুঝি?

—না। কপালীর জঙ্গলে আমার চোখ চেপে ধরবে যে, সে মধুমালা।

—যাঃ! পেত্নীটেত্নী হতেও পারত।

—উঁহু। দিনদুপুরে পেত্নীর অত সাহস হবে না।

মধুমালা আকাশে দ্রুত তাকিয়ে বলে—বড্ড রোদ এখানে। ছায়ায় এস না দিব্যদা।

দিব্য কথা মেনে একটা হিজলগাছের ছায়ায় যায়। গাছের তলায় ঘাসের ওপর শুকনো পাতা আর শীষালো হিজলফুল ছড়িয়ে রয়েছে। এক ঝাঁক ছাতারে পাখি পাতা উল্টে পোকা খুঁটে খাচ্ছিল। বড় একটা ভয় পায় না ওদের দেখে। কিছুটা তফাতে সরে যায় এবং আগের মতো নির্ভয়ে হল্লা করতে থাকে। দিব্য বন্দুকটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে রেখে সিগারেট বের করে। বলে—বাপ্‌স! কতক্ষণ সিগারেট খাইনি!

মধুমালা বলে—এই! আমি ধরিয়ে দিচ্ছি।

—পারবে? খুব বাতাস এখানটায়!

—চেষ্টা করা যাক্, পারি কি না।....মধুমালা ওর হাত থেকে দেশলাই নেয়।

দিব্য দুষ্টুমি করে বলে—অভ্যেস থাকলে পারবে।

—উঁ?

—কাকেও কখনও ধরিয়ে দিয়েছ সিগারেট?

—তোমার কী মনে হয়?

—বয়সের তুলনায় তুমি অনেক প্রাজ্ঞ।

—প্রাজ্ঞ মানে?

—ওয়াইজ।

—তার মানে?

—ওয়াইজ মানে জানোনা? স্কুল ফাইনাল পাশ মেয়ে!

মধুমালা মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে দেশলাইকাঠি ঠোকে—আনাড়ি তা বোঝাই যায়। জ্বলতেই দ্রুত ফেলে দেয় কাঠিটা। হাত ঝাড়তে থাকে। একেকটা কাঠি থাকে—যার বারুদ গোড়াঅব্দি মাখামাখি, এবং সঙ্গে সঙ্গে আঙুলে ছ্যাঁকা লাগে। অস্ফুট স্বরে সে বলে—উঃ! আর দিব্য তার হাতটা ধরে ফেলে। কতটা পুড়ল, দেখার জন্যেই। মধুমালা ছাড়াবার চেষ্টা করে। পায়ের কাছে শুকনো পাতা তখন হুহু করে জ্বলে উঠেছে।

মধুমালা চেঁচিয়ে ওঠে—নেভাও! নেভাও! সর্বনাশ হয়ে যাবে।

দিব্য নির্বিকার বলে—কী সর্বনাশ হবে! জ্বলুক—দেখতে ভাল লাগছে।

মধুমালা এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নেয়। আতঙ্কে সরে গিয়ে বলে—সর্বনাশ হবে যে! জঙ্গলে আগুন ধরে যাবে! দিব্যদা! তুমি জানো না - ভীষণ ব্যাপার হবে।

—আগুন জ্বলা দেখতে ভাল লাগেনা তোমার?

গাছের তলায় শুকনো পাতায় আগুন হু হু করে এগিয়ে চলেছে! ধোঁয়া উঠছে। পোকামাকড় পালাচ্ছে হন্তদন্ত হয়ে। ছাঁতারে পাখিগুলো ভয় পেয়ে উড়ে গাছের ডালে গেছে এবং তুমুল চেঁচামেচি জুড়েছে। দিব্য এবার বুঝতে পারে, সত্যি এই আগুনটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। সবখানে প্রচুর শুষ্কতা। ঝোপঝাড় আর বিস্তীর্ণ কাশবন শুকিয়ে বারুদ হয়ে আছে। তবু সে ইচ্ছে করেই নেভায় না। মধুমালার ব্যাকুলতা উপভোগ করে।

মধুমালা প্রায় কেঁদে ফেলার ভঙ্গীতে বলে— তুমি শহরের ছেলে কি না? বুঝবে না—তুমি কিছু বুঝবে না। তারপর নিজেই পায়ের স্লিপার দুটো ব্যস্তভাবে খুলে দু'হাতে নেয়। এবং বসে পড়ে। আগুনে জুতোর বাড়ি মারে। ঘষতে থাকে।

দিব্য হাসতে-হাসতে বলে—তোমায় ওয়াইল্ড বলছিলুম। উইথড্র

করছি। তুমি বোকা।

মধুমালা রেগে যায়।—বেশ। আমি বোকা তো বোকা!

এবার দিব্য আগুনের বৃত্তরেখা-বরাবর পায়ের জুতো দিয়ে এক-হাত দূরে সমান্তরাল রেখার মতো শুকনোপাতা সরিয়ে দেয়। বৃত্তাকার আগুন নিরাপদে জ্বলে ছাই হয় এবং আর এগোতে পারে না। তখন সে বলে—শহরের ছেলেরা কীভাবে আগুন নেভায়, দেখলে তো?

মধুমালা উঠে দাঁড়ায়। জুতো দুটো পরে গম্ভীরমুখে এগিয়ে গাছের গুঁড়িতে হেলান দেয়।

দিব্য সিগারেটটা ধরিয়ে নিতে আগুনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু তখনই সরে এসে মধুমালার উদ্দেশ্যে বলে—হ্যাঁ, তুমি ধরিয়ে দেবে।

তারপর ওর কাছে চলে আসে। অবাক হয়ে ফের বলে—দেশলাই? দেশলাই কই? বাঃ! দেশলাইটা বুঝি ফেলে দিয়েছ সঙ্গে সঙ্গে!

মধুমালা জবাব দেয় না। তার আঙুলে ছ্যাঁকা লেগেছিল। সে আঙুলটার দিকে তাকিয়ে আছে।

দিব্য ব্যস্তভাবে দেশলাইটা খুঁজে বেড়ায়। পা দিয়ে ছাই উল্টে দেখে। আগুন নিভে গেছে। বাতাসের ঝাপটানিতে কোথাও ধোঁয়ার সঙ্গে অঙ্গারের ছটা—উজ্জ্বল রোদে তা খুবই নিষ্প্রভ। তারপর দেশলাইটা দেখতে পায়। অক্ষত পড়ে রয়েছে একটু তফাতে। সেখানে কচি কিছু ঘাস শুকনো পাতার ফাঁকে মুখ বের করে আছে।

মধুমালাও খুঁজছিল আড়চোখে। সেও একই সঙ্গে দেখতে পায়। এবং দুজনে একই সঙ্গে লাফ দিয়ে যায়। একই সঙ্গে হাত বাড়ায়।

দিব্যের হাত মধুমালার হাতে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে মধুমালার

মুখ লাল হয়ে যায়। এক মুহূর্তের জন্যে দিব্যির মনে হুলুস্থুল ঘটে। কিন্তু সে নিজেকে সামলে নেয়।

দুজনে হিজলগাছের ছায়ায় এসে গুঁড়িতে পিঠ রেখে বসে। মধুমালা এবার সাবধানে দেশলাই জ্বালে। দিব্য দুহাতে তার জ্বলন্ত কাঠিধরা হাত ঘেরে এবং সিগারেট ধরিয়ে নেয়। তারপর বলে—খুব ভয় পেয়েছিলে খুকু ?

—কেন ?

মাথা দেলায় দিব্য।—এমনি। মনে হল তুমি যেন হঠাৎ ভয় পেলে।

—কখন ?

—দেশলাইটা কাড়াকাড়ির সময়।

মধুমালার মুখটা আবার লাল হয়ে যায়। সে মুখ ফিরিয়ে অস্ফুট বলে—যাঃ!

দিব্য কিছুক্ষণ সিগারেট টানার পর বলে—হঠাৎ চলে এলে! বকুনি খাবে যে।

মধুমালা সে কথা পাশ কাটিয়ে বলে—বাবা কী বললেন ?

—তুমি ওঁকে সব বলে দিয়েছ কেন ?

—বেশ করেছি। আমার পেটে কথা থাকে না।

—আর কাকে বলেছ ?

—আর কাকেও বলিনি।....মধুমালা স্বচ্ছন্দভাবে জানায়। বাবা আইন বোঝেন। তাই বলেছি। বলে ঠিক করিনি ?

—হুঁ।

—বাবা কী বললেন, বলছনা কেন ?

—বললেন....দিব্য একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে—বললেন, অন্যায় কিছু করিনি। ব্ল্যাকমেলারকে খুন করা পাপ নয়।

—বাবা তা তো বলবেনই।

—কেন বলো তো ?

—খুনটুন নিয়ে মামলামোকর্দমা করা অভ্যেস বাবার। তাই।

দিব্য ভেবেছিল, প্রমথের সেই ভয়ঙ্কর ব্যাপারগুলো বুঝি তার মেয়ে জানে। জানে না দেখে আশ্বস্ত হয়। বলে—উনি ব্যাপারটা সহজভাবে নিলেন। কিন্তু···কিন্তু····

—কী ?

—আমার বিবেক। ····হঠাৎ আবেগে অস্থির হয়ে যায় দিব্য। সারাক্ষণ লোকটার বউ আর অসহায় ছেলেমেয়েগুলোব চেহারা মনে ভেসে আসছে। ওরা তো কোন দোষ করেনি। ওদের যে আমি দুঃখের পথে ভাসিয়ে দিলুম। ওরা তো আমায় ক্ষমা করতে পারবেনা, খুকু

মধুমালা নির্বিকার মুখে বলে—পারবেই না। কেন পারবে ? তুমি তো শাস্তিটা ওদেরই দিলে !

—হ্যাঁ। তখন একথাটা ভাবিনি।....দিব্যের চোয়াল আঁটো হয়ে যায়। সিগারেটটা ঘষে নেভায় জুতোর তলায়। ফের বলে—কিন্তু এখন আমি কী করব ?

—কী করবে ?

দিব্য অস্থির হয়ে বলে—এর শাস্তি আমাকে দেওয়া হলেও ওদের যে শাস্তি অকারণে চাপিয়ে দিয়েছি, তা তো তারা ভুগবেই। ছেলে-মেয়েগুলো এডুকেশন পাবে না। খেতে পাবে না। মাতাল জঘন্য চরিত্রের বাবা। আমি তো জানি, একপয়সা জমিয়ে রাখেনি লোকটা। সব দুহাতে উড়িয়েছে। কিন্তু সে বেঁচে থাকলে ওরা খেয়েপরে বাঁচত। লেখাপড়া শেখার সুযোগ পেত !

মধুমালা উদ্বিগ্ন মুখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। কিছু বলতে পারে না।

—আমি শালা বাস্টার্ড ! দোষ তো আমারই। যখন সমাজ

বদলাবো বলে সমাজ ধ্বংস করতে ছুটে গিয়েছিলুম, তখন নিজেই ধ্বংস হয়ে গেলুম না কেন? আমি শালা লোভী হ্যাংলা কুকুর! ওয়েষ্টার্ন মড সেজে বিলিতি কুত্তার ভেক ধরে ফপিশ লাইফের লোভে নিজেকে চাকরি-বাকরির লাইনে ভিড়িয়ে দিলুম। পপকালচারে মুখ লুকিয়ে বাঁচতে চাইলুম। অথচ এই আমি—ভালভাবেই জানি, এর নাম সংকীর্ণ স্বার্থপরতা! এব নাম দালালী। এর নাম ভিড়ের ভেড়া হয়ে হেঁটে যাওয়া!

বলতে বলতে সে ঘোরে মধুমালার দিকে। জ্বলজ্বলে চোখের দৃষ্টিতে তাকিয়ে চাপা গলায় বলে—তোমার বাবা এই জঙ্গলে বুনো শুওর ভেবে গুলি কবে মেরেছিলেন একটা মানুষকে! তুমি বন্দুক ছুড়তে পারো না মধুমালা? বলবে—দৈবাৎ এ্যাকসিডেণ্ট দিব্যদার বুকে গুলি লেগেছিল! বলো, পারবে না বলতে?

মধুমালা ফোঁস করে ওঠে।—খুব হয়েছে! থামো! পরমুহূর্তে সে হাসিতে ভেঙে পড়ে। বলে—বাঃ! এবার আমার হাতে হাতকড়া পরাবার মতলব!

তারপর স্তব্ধতা কতক্ষণ।...

আর একসময়, সকাল ও দুপুরের সন্ধিকালে, বনভূমির সব চঞ্চলতা অসাধারণ রোদে জ্বলে যেতে-যেতে বিষণ্ণতা বেরিয়ে পড়েছে ছায়া থেকে—মাটি থেকে শোকসঙ্গীতের মতো সুর উঠেছে, কারণ ঘাসফড়িং আর পোকামাকড়গুলো দলেদলে ডাকতে শুরু করেছে। পিছনের জামবন থেকে সেই ঝিঁঝিপোকার ডাক আরও তীব্র হয়েছে! মাঝে-মাঝে আসছে কোন অন্যমনস্ক বাতাস—কাঠকুড়ানী একলা মেয়ের মতো। দিব্যের হাত আলগা হয় এবং হাতটা তুলে নেয় সে। হাতে মধুমালার শ্বাস অনুভব করে। মধুমালা বলে—মদন এসেছিল কেন?

—কে সব এসেছে নাকি! সদরের সরকারী অফিসাররা।

—ও! আমি ভেবেছিলুম....

—পুলিশ ?

—হুঁ।

দিব্য একটু হাসে।—তোমার কাছে আশ্বাস পেয়েছি ও ব্যাপারে।

মধুমালা খুশি হয়ে বলে—সেজন্যেই তো বাবাকে তোমার বিপদের কথা সব বলেছিলুম।

—এখন তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করছি।

—আগে বুঝি ভীষণ বোকা ভাবছিলে ?

—না। তাহাল তোমায় কিছু বলতুম না।

—আচ্ছা, দিব্যদা !

—উঁ ?

—কলকাতার কথা বলো না।

—কী কথা ? কলকাতা কখনও দেখনি বুঝি ?

—ভ্যাট ! তা নয়।

—তবে কী ?

—তোমার কলকাতার লাইফের কথা।

—বুঝেছি।....দিব্য মুখ টিপে হাসে।

—কী বুঝেছ ?

—আমার ভালবাসার খবর জানতে যাও তো ?

মধুমালা মুখ ফিরিয়ে কুমারীর লজ্জায় বনভূমি শিহরিত করে বলে—তুমি অসভ্য !

—তুমিও খুব সভ্য কি, খুকু ?

—হুঁ, আমি জংলী। মা বলে, দাদা বলে—কপালীতলার সবাই বলে মোক্তারবাবুর মেয়ে জংলী ! কারণ আমি জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসি। সবাই বলে কী জানো ? যদি মোক্তারবাবুর বাড়ি না জন্মে বাউরি ছুলেদের বাড়ি জন্মাতুম, সেটাই নাকি আমার যোগ্য হত। ভুল করে ওবাড়িতে জন্মেছি।....একদমে কথাগুলো বলে

মধুমালা হেসে ওঠে।—তুমি জানো, আমার সত্যিকার কোন বন্ধু নেই? আমি ভীষণ একা-একা ঘুরি?

—টের পাচ্ছি।

—কেন, তা বিশ্বাস করবে দিব্যদা?

—নিশ্চয় করব।

—কপালীর মন্দিরে মানত করে আমার জন্ম, তাই।

—বুঝলুম না।

—কপালীর মন্দিরটা কোথায় দেখলে না? জঙ্গলের মধ্যে। কপালীমা আমাকে বেঁধে রেখেছেন, বুঝতে পারছ না? সব সময় আমার মন পড়ে থাকে এখানে—নদীর এপারে। একবেলা না এলে কিছু ভালো লাগেনা যে।

দিব্য অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। মধুমালার নিষ্পাপ সরলতার উৎসটা সে এবার যেন পরিষ্কার দেখতে পায়। যেভাবেই হোক, ওর মাথায় এসব ঢুকে গেছে। এই বোধ থেকে মেয়েটির হয়তো আর পরিত্রাণ নেই। কুসংস্কার হোক, আর ন্যাকামি হোক, এর মধ্যে হয়তো কোন গভীর ব্যাপার আছে—যা সত্য। যেন আছে কোন আদিম প্রতিশ্রুতি—যা পালন করে যেতে হবে বেচারীকে। একদিন আরও বড় হবে। স্বামী ছেলেপুলের সিন্দুকে ওর অস্তিত্ব বন্ধক রাখা হবে। কিন্তু ও যেন মূলত প্রকৃতির। দিব্য আনমনে বলে—তুমি···ডটার অফ নেচার তাহলে? প্রকৃতিকন্যা!

মধুমালা নির্দ্বিধায় হঠাৎ ওর হাত নিয়ে বলে—বলো না দিব্যদা কলকাতার কথা।

দিব্য মাথা দোলায়।—আমার কোন ভালবাসার মেয়ে ছিলনা।

—বিশ্বাস করি না। একশো দিব্যি দিলেও, না।

—কেন, খুকু?

—কলকাতার ছেলেমেয়েরা···বাব্বা! সব জানি আমি।

—খুকু তোমার বয়স কতো ?

—হঠাৎ ওকথা কেন শুনি ?

—সম্ভবত আমার বয়স তোমার ডবল।

—দাদার বুলি। দাদা সবসময় বলে কী জানো ? মধুমালা সুকুমারের কণ্ঠস্বর ভেংচি কেটে বলে—জানিস খুকু, আমি তোর ডবল বয়েস ?

—ঠিকই বলে। ডবল বয়সী মানুষের সঙ্গে ফাজলেমি করতে নেই। বিপদ হতে পারে।

—কিসের বিপদ ?

—ভালবাসার কথা শোনার বিপদ।

মধুমালা চমকে ওঠে একটু। ওর দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়। তার উজ্জ্বল ঘাড় গলা কানের লতি থেকে গলাঅব্দি শিহরণ ওঠে। দিব্য তা খুঁটিয়ে দেখতে পায়। তারপর মধুমালার হাতটা আলগা হয়ে যায়। অস্ফুটস্বরে বলে—আমায় কেউ ভালবাসতে পারে না। আমি তো কারু মনের মতো নই। কারু মন জুগিয়ে কথা বলতে পারিনে। সবাই বলে মেয়েটা সৃষ্টিছাড়া।

তারপর হঠাৎ সে উঠে দাঁড়ায়। দিব্য বলে—রাগ করে চলে যাচ্ছ ?

মাথা দোলায় মধুমালা। তারপর বেণী বুকের দিকে নিয়ে নতুন করে বাঁধতে থাকে। এতক্ষণ যা কিছু হয়েছে, সব পায়ের তলে মাড়িয়ে বলে—বাবা তোমাকে শিকার করতে বলে যান নি ? কই—ওঠ। পাখি-টাখি মারো !

—নাঃ ! কিছু ভাল লাগে না। তুমি ইচ্ছে করলে বাড়ী যেতে পারো।

—আর তুমি ?

—এখানেই বসে থাকব।

—কতকাল ?

—যদ্দিন না মরি।

অমনি মধুমালা তার দিকে ঝুঁকে কাতুকুতু দিতে থাকে!—ফের কুলক্ষুনে কথা? ওঠ—ওঠ বলছি। ওঠ। না উঠলে····

দিব্য বাধ্য ছেলের মতো উঠে দাঁড়ায়।

—ওই যে নদীর ধারে, বাঁকের কাছে বাঁশবন দেখছ! ওর পিছনে ভীষণ জঙ্গল আছে। এর চেয়েও বেশি জঙ্গল। ওখানেই নাকি সরকারী রিজার্ভ ফরেষ্ট হবে। বাবা তদ্বির করছেন। যাবে ওখানে?

—তুমি যাবে তো?

মধুমালা একটু ভাবে। ঘুরে উত্তরপশ্চিমে কপালীতলা দেখে নেয়। তারপর বলে—ফিরে গিয়ে কিন্তু প্রচণ্ড বকুনি খেতে হবে। মায়ের শুধু নয়—বাবারও।

—খাবে বকুনি।

মধুমালা আবার একটু ভাবে। তারপর আস্তে আস্তে বলে—আমি তো অন্যায় করিনি!

দিব্য ওর একটা হাত নেয়। মধুমালা আবার লজ্জায় রাঙা হয়ে মুখ নামিয়ে বলে—ওখানে একটা লোক মোষ চরাচ্ছে। দেখছে। হাতটা ছেড়ে দাও।····

দুজনে বাঁধে ওঠে। ফাঁকা খোলামেলা কিছুদূর। সূর্যের তাপ ততক্ষণে কড়া হয়েছে। কাছাকাছি ছায়া নেই। স্লুইস গেটের নীচে জাল পেতে জেলে ও জেলেনী একবুক জলে দাঁড়িয়ে ছিল। মুখ তুলে ওদের দেখতে থাকে। মধুমালা ওপর থেকে ঝুঁকে বলে—নেত্যদা! মাছ পাচ্ছ তো?

—তেমন পাচ্ছিনা দিদিমণি।

—যা পাচ্ছ, তাই খুব। ফেরার সময় নিয়ে যাব। দেখছ না? কলকাতার লোক এসেছে। মাছ লাগবে না?

লোকটা হাসে। মেয়েটি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দিব্যকে দেখে। দিব্যের চেহারা সায়েবদের মতো—হয়তো তাই। উঁচুতে ফুটফুটে ফর্সা একটা শরীর। সেও তো কম চমকপ্রদ নয়। এই জল-জঙ্গলের নিসর্গে বড় উদ্ভট লাগার কথা। দিব্য নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে যুবতী মেয়েটির দিকে। খালি গা। ভিজে কাপড়ে স্তনদুটি পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। কিন্তু ওর তো এতটুকু সংকোচ নেই। শরীর নিয়ে এতটুকু বাতিক নেই যেন। শরীর ওর কাছে স্বাভাবিক ব্যাপার।

আরও কিছুটা এগিয়ে প্রথম যে গাছটা সামনে এল, তার তলায় দাঁড়ায় দিব্য। মধুমালা বলে—দাঁড়াচ্ছ কেন? এরি মধ্যে টায়ার্ড?

দিব্য মাথা দোলায়। তারপর ফের পা বাড়ায়। ক্লান্তি এসেছে, সত্য। সেটা শারীরিক কারণে নয়, উদ্দেশ্যহীনতার জন্যে।

একটু পরে খোলামেলাটা শেষ হয়ে যায়। কাশব্যানাকুশে ঢাকা কয়েক একর জমির ওপর পায়েচলা রাস্তা পেরিয়ে ওরা বাঁশবনের কাছে পৌঁছয়। বাঁশবনটা দূর থেকে যত ঘন দেখাচ্ছিল, ততটা ঘন নয়। ভেতরে শুকনো বাঁশপাতার স্তূপ। প্রচুর ফাঁকা। এখানে আরণ্য ভাবটা আরও বেশি- দিব্য অনুভব করতে পারে। কিন্তু বিহারের জঙ্গলের সেই উগ্র রুক্ষতা নেই, কিংবা নেই তরাই বা আসামের জঙ্গলের মতো দুর্ভেদ্যতা আর স্যাঁতসেতে ভাব। ভাগীরথীর সমতলা অববাহিকায় এইসব বনভূমি খুব সাজানো গোছানো। এর মধ্যে অহিংস প্রশান্তি আছে। দিব্য স্মৃতির মধ্যে ডুবে যেতে থাকে।

বাঁশবনের পর সত্যিকার জঙ্গল বলা যায়। উঁচু-উঁচু ঘন গাছ-পালা আর লতাপাতা জড়াজড়ি করে সেখানে একটা দুর্গমতা সৃষ্টি করেছে। দিব্য এখন মুগ্ধ হয়ে বলে ওঠে—বা.

মধুমালা কেমন হাসে।—এদিকে বারদুত্তিন এসেছি। সেও বাবা বা দাদার সঙ্গে। তখন নাকি বাঘ থাকত।

—এখন থাকে না ?

—সবাই বলে আর বাঘ নেই। সবগুলো মোক্তারবাবু মেরে শেষ করে দিয়েছেন।

—ঠিকই করেছেন। তাঁর মেয়ের নির্ভয়ে চলাফেরার জন্যে।

বাবার গর্বে গর্বিতা মধুমালা বলে—হুঁউ। তাছাড়া এই এলাকা পুরোটা আমার দাদুর, জানো তো ?

—কেমন করে জানব ?

—বাবা ইচ্ছে করেই ফেলে রেখেছেন। সবাই বলে, গাছগুলো কেটে রাতারাতি বেচে দেওয়া উচিত। অনেক টাকা হবে। কারণ, গভমেণ্ট তো দখল করে নেবে সব। বাবা কী বলেন জানো ? বাবা বলেন, নিক না দখল। তবে ট্রাকটার বা ডোজার চালিয়ে উচ্ছেদ করে চাষবাস করা চলবে না। রিজার্ভ ফরেষ্ট করতে হবে। আজ বোধহয় ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের অফিসাররা এসেছে। গিয়ে শুনব, এইসব নিয়ে কথা হয়েছে। বাবা বলেন—জন্তুজানোয়াররা···

দিব্য ওর কাঁধে হাত রাখতেই মধুমালা থামে। একটু আড়ষ্ট হয়ে পা ফেলে। দিব্য বলে—আরণ্য স্বাধীনতা কাকে বলে জানো, খুকু ?

—উঁ ?

—আরণ্য স্বাধীনতা। তারমানে, বনজঙ্গলে একরকম স্বাধীনতা আছে। মানুষ সেখানে গেলে সেই স্বাধীনতা পায়।

—তুমি পেলে বুঝি ?

—তুমি পাচ্ছ না ?····

দিব্য থামে। তারপর ওর দুকাঁধে হাত রাখে। ফের বলে—কেন এখানে আমায় নিয়ে এলে, মধুমালা ?

মধুমালা প্রথমে অবাক, পরে বিব্রত—তার চঞ্চলতা ফুটে ওঠে চোখে, শরীর ব্যাপী। সে সেই বিস্মিত অস্থিরতা নিয়ে বলে—তুমি বন্দুক ছুড়বে, দেখব। খরগোস মারবে। এখানে খরগোস আছে

অনেক। হরিয়াল মারতে চাও, তাও আছে। অনেকরকম পাখি আছে।

—কিন্তু আমি আর কিছু মারব না, খুকু।

—তাহলে ফিরে চলো।

—না।

—তবে ?

মধুমালা নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে। কাঁটাঝোপে আটকে গেলে যেভাবে সাড়ি ছাড়িয়ে নেয়, সেভাবেই। কিন্তু পারে না। দিব্যের দুই নিষ্পলক তীব্র দৃষ্টি তাকে ভয় পাইয়ে দেয়। দিব্য চাপা স্বরে বলে—তুমি কি ভয় পাচ্ছ ?

—হ্যাঁ।

—কেন ?

—তুমি অমন করছ কেন ?

—কী করছি, খুকু ?

মধুমালা অসহায় হয়ে নিজের পায়ের দিকে দৃষ্টি ফেলে—মুখটা নামায়।

একটু পরে দিব্য বলে—একি ! ভয়ে তুমি কেঁদে ফেললে যে !

তারপর মধুমালা যা বলে ওঠে, দিব্য ভীষণ চমকায় এবং তক্ষুনি তার কাঁধ ছেড়ে দেয়। মধুমালা মুখ নামিয়ে কান্নাজড়ানো গলায় বলে—আমি ওসব কখনও করিনি।...

দিব্য প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল—কী সব, কিন্তু সে প্রশ্ন করার মেজাজ নেই। রাগে জ্বলে ওঠে সে। পকেটে হাত ভরে দ্রুত সিগারেট বের করে। জ্বেলে নেয়। তারপর হনহন করে এগিয়ে যায় সামনের দিকে। একটা বিশাল বটের তলায় অজস্র ঝুরি—সেখানে গিয়ে একবার ঘোরে। দেখে, মধুমালা সেভাবেই দাঁড়িয়ে আছে।

কতক্ষণ একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকে সুকুমারের বোন।

তারপর দিব্যের একটু অনুতাপ হয়। সে ডাকে—খুকু। এখানে এস।

বেশ কয়েকবার ডাকার পর মধুমালা যায়। গিয়ে সে একটা লম্বা মোটা শেকড়ে বসে পড়ে। তারপর নিঃশব্দে শাড়ির নীচের দিক থেকে চোর কাঁটা ছাড়াতে থাকে।

দিব্য একটু হেসে তার সামনে নগ্ন মাটিতেই বসে পড়ে। বন্দুকটা শুইয়ে রেখে সেও মধুমালার শাড়ি থেকে চোরাকাঁটা ছাড়াতে থাকে।

মধুমালা কিছু বলে না। বাধাও দেয় না। দিব্য সস্নেহে বলে—তুমি জংলী সত্যি। লেখাপড়া শিখলে কী হবে, তুমি ভীষণ গেঁয়ো আর বোকা মেয়ে। নয় তো সবসময় ওই এক ভয় নিয়ে ঘুরতে না—ওই একই কথা বলতে না। দেখ খুকু, আমি আগেও দেখেছি—যখন আণ্ডার গ্রাউণ্ডে বিপ্লবের খেলা করতে গিয়েছিলুম, গ্রামের মেয়েরা ভীষণ শরীরসচেতন। সেক্সকনসাস! একজন পুরুষের সঙ্গে অন্যরকম সম্পর্কের কথা তারা ভাবতেও পারে না। আমেরিকানদের মতো। লাভ-মেকিং মানেই নির্ভেজাল সেক্স। আমি সেক্সের কথা ভাবি নি, খুকু। বিশ্বাস করো।, তুমি এতটুকু মেয়ে! আমি তো জানোয়ার নই।

মধুমালা ফোঁস করে উঠে এতক্ষণে।—থাক। আর লেকচার নয়। তেষ্টা পেয়েছে। জল খাব।

—এখানে জল কোথায় পাবে?

—পাব। ওপাশে কপালী। তোমার তেষ্টা পেলে চল এস।

—পেয়েছে।

দুজনে ওঠে। উত্তরে গাছপালা ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে অনেকটা গিয়ে দিব্য দেখে, রেলব্রিজের কাছে চলে এসেছে। এখানে নদী ঘুরে পশ্চিমে গেছে। নদীতে দহ আছে। ঘন কালো জল।

দুজনে ঢালু পাড় বেয়ে দৌড়ে নামে। হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে আঁচলভরে জল খায়।.....

তারপর নদীর ধারের নীচু বাঁধে বসে দিব্য সিগারেট ধরায়। রেলব্রিজ কাঁপিয়ে একটা মালগাড়ি যেতে থাকে। ততক্ষণ কেউ কোন কথা বলেনা।

মালগাড়িটা চলে যাওয়ার পর মধুমালা বলে—কটা বাজল?

—মোটে সাড়ে দশটা। কেন?

—এমনি।...বলে সে হঠাৎ অস্থির হয়ে ওঠে। উঠে দাঁড়ায়। দিব্যের কাঁধের কাছে জামা খামচে ধরে বলে—ওঠ। কিছু মেরে না নিয়ে গেলে কথা উঠবে।

—কী কথা?

—বোঝ না? সবাই ভাববে, জঙ্গলে ওরা এতক্ষণ কী করছিল!

দিব্য হাসতে-হাসতে ওঠে।—চলো, দেখি! অগত্যা হরিয়াল মারব। আইন ভাঙতে একসময় খুব আনন্দ পেতুম। আবার ভেঙে ফেলি! হরিয়াল মারা আজকাল বেআইনী।

গাছপালার মধ্যে ঢুকে মধুমালা ঘনিষ্ঠ হয় দিব্যের। গা ঘেঁষে হাঁটে! তারপর অদ্ভুত চাপা গলায় বলে—কিন্তু সাবধান, অমন করে আর আমার দিকে তাকিও না। আর যা খুশি করো আপত্তি নেই।

—যা খুশি? দিব্য ওর কাঁধে হাত রাখে। বেশ। চুমু খাই যদি?

মধুমালা মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে বলে—আচ্ছা, চুমু খেলে মেয়েদের পেটে বাচ্চা আসে না তো?

দিব্য জোরে হেসে ওঠে। তারপর দ্রুত ওর মুখটা দুহাতে ধরে ঠোঁটে ঠোঁট রাখে। মধুমালা চুপ করে থাকে। বনভূমিতে একটা ঘূর্ণিহাওয়া ঢুকে পড়ে। দুজনকে পেরিয়ে যায়।....

॥ নয় ॥

তখন সূর্য মাথার ওপর। ঘাসে শুকনো পাতার মচ মচ শব্দ শুনে মধুমালা ঘুরে তাকায়। দিব্যের পাঁজরে দ্রুত খোঁচা দিয়ে সে তখনই একটু সরে বসে। ফিসফিস করে বলে—মহিষাসুর! হুঁউ-যা ভেবেছিলুম।....

দিব্যও ঘুরে তাকায়। মদন আসছে। কিন্তু তার হাতে দিব্যের ব্যাগ! পিছনের ঘাসজমি পেরিয়ে সে এদিক-ওদিক খোঁজে। এরা ঝোপের পাশে ঘন পাতাভরা বাঘনখা গাছের ছায়ায় বসে আছে। আর ঘাসজমিটা ফাঁকা - সেখানে তীব্র রোদের ঝলকানি, তাই হয়তো গরিলাটার চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। তারপর সে কপালে হাত রেখে সূর্য আড়াল করেছে।

মুহূর্তে দিব্য নার্ভাস হয়ে ডাকে—মদন! এখানে।

স্বভাবত মদনের হাঁসার কথা, হাসে না। তার হাতে দিব্যের ব্যাগ এবং তার আসার ভঙ্গীতে সতর্কতা—তাই এরা দুজনে তখনই বুঝেছে, একটা কিছু ঘটেছে। দুজনেই নিষ্পলক চোখে তাকে দেখতে থাকে।

মদন প্রায় দৌড়েই আসে। তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যায়, ফুসফুসে বাতাস টানতে সে প্রকাণ্ড হাঁ করে। তারপর কোনরকমে বলতে পারে—পালিয়ে যান!

মধুমালা উঠে দাঁড়ায় সঙ্গে সঙ্গে। তার ঠোঁট কাঁপে। দাঁতে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে সে বলে—তার মানে?

—পুলিশ পুলিশ! মদন অতিকষ্টে কথাটা বলেই দিব্যের ব্যাগটা

দিব্যের কোলে ফেলে দেয়। সে পিছনদিকটা ঘুরে দেখে ফের বলে —ওনারা পুলিশ! বাবুদাকে ধরবে বলছে।

দিব্য গম্ভীর হতে চেয়েছিল। পারে না। সে একটু হেসে ব্যাগটা খুলে দেখে নেয় তার প্যান্টশার্টও গুঁজে দেওয়া হয়েছে এটার মধ্যে।

তারপর দিব্য উঠে দাঁড়ায়। ওদের সামনে নিঃসঙ্কোচে সুকুমারের পাঞ্জাবি, তারপর পাজামাটাও খুলে ফেলে। নিজের প্যান্ট-শার্ট পরতে থাকে। আর মধুমালা সেই সময় আচমকা হাত তুলে মদনকে মারতে যায়। মদন একটু পিছিয়ে গিয়ে হাসবার চেষ্টা করে।

হাঁফাতে হাঁফাতে মধুমালা বলে—বুদ্ধু গাড়োল হতচ্ছাড়া মহিষাসুর!

মদন হাঁফ সামলে নিয়েছে ততক্ষণে। মুখ হাঁড়ির মতো। ঘড়ঘড় করে বলে—আমাকে বকলে কী হবে? গিন্নিমা বললেন যে! লুকিয়ে ওনার ব্যাগ আমাকে দিয়ে খিড়কির দোরে ঠেলে দিলেন। বললেন, দিয়ে আয় গে এক্ষুণি। পালিয়ে যেতে বল্‌গে।

মধুমালা আরও ক্ষেপে গিয়ে বলে—আর তোমারও পালে বাঘ পড়ে গেল?

দিব্য সুকুমারের কাপড়-চোপড় মদনের হাতে গুঁজে দিয়ে বলে —সুকুমার কেমন আছে, মদন? ওকে বোলো—যেখানেই থাকি, চিঠি দেব।

মধুমালা ফুঁসে ওঠে—এসব মিথ্যে! মা ওকে চালাকি করে পাঠিয়েছে। মাকে আমি চিনিনে?

মদন বাধা দিয়ে বলে—আজ্ঞে না দিদি, না। সত্যি সত্যি পুলিশ এয়েছেন গো।

দিব্য দেখতে পায়, মধুমালার চোখে জল ছলছল করছে। দিব্য বলে—ও নিশ্চয় মিছে বলছে না, খুকু। তখন তোমার বাবাকে ডেকে

'নিয়ে গেল—তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল। আর তোমার বাবাও আমাকে সাবধানে থাকতে বলে গেলেন।

মধুমালা বলে—না। এ মায়ের চক্রান্ত। মাকে তুমি চেনো না!

মদন বলে—আজ্ঞে না দিদি। মা কালীর দিব্যি। তখন জিপ-গাড়িতে সাদা পোষাকে ওনারাই এসেছেন। মোক্তারবাবু বললেন—সুকুব দুই বন্ধু কলকাতা থেকে এয়েছিল বটে। তারা তো কালই চলে গেছে। ওনারা বিশ্বাস করলেন না। তক্কাতক্কি হচ্ছিল কর্তাবাবুর সঙ্গে। ইদিকে গিন্নিমা তক্ষুণি সব শুনে আমাকে...

মধুমালা চোখে জল নিয়ে ধমক দেয়—থামো! ওসব বানানো। মা তোমাকে শিখিয়ে পাঠিয়েছে।

মদন দিব্যি কাটতে যাচ্ছিল, দিব্য তাকে থামিয়ে ব্যস্তভাবে বলে—খুকু, এখানে এভাবে আর চ্যাচামেচি করা ঠিক নয়। আমি যাই। তোমাদের বন্দুকটা তুমি নিয়ে যাও—যদি দৈবাৎ দেখ, ওরা নদীর এপারে এসে পড়েছে, জিগ্যেস করলে বলবে—বন্দুক ছোড়া প্র্যাকটিশ করছিলে। ব্যস! লক্ষ্মিটি!

সে বন্দুকটা তুলে মধুমালার হাতে গুঁজে দেয়। মধুমালা বন্দুকটার কুঁদো মাটিতে ঠেকিয়ে রাখে। চোখে জল ছলছল করছে। নাসারন্ধ্র কাঁপছে। কপালের ওপর ফুরফুরে কিছু চুল ওড়াউড়ি করছে—কোথাও একটা প্রচণ্ড ঝড় চলেছে বুঝি। দুপুরের বনভূমি হঠাৎ ঘোর স্তব্ধ হয়ে গেছে। কোন পাখিও আর ডাকছে না। মদন ডাকে—এস দিদি!

মধুমালা দ্রুত ঘুরে দিব্যকে বলে—তুমি কোথায় যাবে?

দিব্য একটু হাসে। মাথাটা নাড়ে। বলে—বুঝতে পারছিনে। পরে ষ্টেশন এখান থেকে কতদূরে?

মদন বলে—গিন্নিমা তাই বলেছেন বাবুদা! পরের টিশান সোনাইতলা—মোটে ক্রোশ আড়াই। রেলের ধারে-ধারে চলে যান।

দুটোর গাড়ি পেয়ে যাবেন।

মধুমালা ছটফট করে বলে—কিন্তু ওর যে খাওয়া হয় নি, সে কথা খেয়াল নেই মায়ের? এত যে ভাল করার চেষ্টা, টিফিন-কেরিয়ারে খাবার দিয়ে পাঠাল না কেন? আমি সব বুঝি।

—খেয়ে নেব'খন। দিব্য সরল মনে হেসে বলে। সোনাইতলায় কিছু খেয়ে নেব। ও তুমি ভেবো না।

মধুমালা বলে—রেললাইনের ধারে কোন গাছ নেই। সারাপথ রোদ্দুর।

—সে ম্যানেজ করে নেব। ভেবো না।

—আমি কিছু ভাবছি না! ভাববার দায় পড়েছে!....বলে মধুমালা দুহাতে মুখ ঢেকে ঘুরে দাঁড়ায়। বন্দুকটা পড়ে যায় এবং চাপা ফোঁপানির আওয়াজ শোনা যায়।

মদন অপ্রস্তুত হয়ে বলে ওঠে—অই! অই! পাগলামি কোরোনা তো দিদি।

দিব্য মধুমালার কাঁধে হাত রেখে ডাকে—খুকু! শোন।

মধুমালা নড়ে না। মদন এগিয়ে এসে বন্দুকটা তুলে নিয়ে বলে—আর দেরী কোরোনা গো। কে জানে, ওনারা ইদিকবাগে এসে পড়লেন নাকি!

দিব্য মদনকে বলে—তুমি বরং এগোও মদন। আমি ওকে দেখছি।

একটু দাঁড়িয়ে থেকে মদন বলে—বন্দুকটা?

—তুমিই নিয়ে যাও। ও পরে যাচ্ছে। আর দেখো, সুকুর জামার পকেটে কয়েকটা কার্তুজ আছে কিন্তু।

মদন সাবধানে সুকুমারের পানজাবি-পায়জামাটা বুকের কাছে ধরে রাখে এবং অন্যহাতে বন্দুকটা কাঁধে নিয়ে পা বাড়ায়। সে খোলা ঘাসজমিটা পেরিয়ে একবার ঘুরে এদের দেখে নেয়। তারপর

গাছ-পালার মধ্যে ঢোকে। দেখতে দেখতে চোখের আড়ালে চলে যায়।

দিব্য মধুমালার দুই কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দেয়।—খুকু! কথা শোন।

মধুমালা নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে। তারপর বলে—না! আমি আর কারও কথা শুনব না। পৃথিবীসুদ্ধু আমার পর—শত্তুর!

—আঃ খুকু! কথা শোন।

মধুমালা কান্নাজড়ানো গলায় বলে—কেন? বাবা এত কীর্তি করেছেন, আর তোমার ব্যাপারটা ম্যানেজ করতে পারতেন না? খুব পারতেন।

—আমার ব্যাপারটা ম্যানেজ করা সম্ভব নয়, খুকু।

—কেন নয়?

—ও কথা থাক, অন্য কথা শোন তুমি। লক্ষিটি, অবুঝ হয়ো না।

মধুমালা মাথা দোলায়।—না। বাবা হয়তো ওদের ম্যানেজ করেছেন এতক্ষণে। শুধু মা গোলমাল পাকিয়ে দিলেন! তুমি যেও না।

দিব্য হাসতে গিয়ে দুঃখিত হয়। মধুমালার এই ছেলেমানুষীতে সরল সৌন্দর্য আছে—ভালবাসা আছে, অপরিণত মনের জোরালো ভালবাসা—সে বুঝতে পারে। আর এই নির্মল বনভূমিতে প্রকৃতিই এমন একটা স্বচ্ছন্দ খেলার আয়োজন করেছিল, খেলা শিগ্‌গির ভেঙে দিতে হল—কারণ মানুষের মধ্যে অনেক পাপ আছে, অনেক গ্লানি আছে। দিব্য নিজের আবেগ দমন করে। সুকুর বোন এমন নির্লজ্জভাবে কেঁদে ফেলতে পারে, সে ভাবেও নি।

দিব্য আস্তে বলে—যাব না, তো কী করব?

—আমি আগে দেখে আসি, ব্যাপারটা সত্যি না মিথ্যে।

—কিন্তু খুকু একদিন না একদিন আমাকে ধরা পড়তেই হবে। আমার বিচার হবে কোর্টে। এটা একটা রিয়্যালিটি।

বলেই দিব্যির মনে হয়, মধুমালা রিয়্যালিটি বুঝতে পারবে কি? সে উপযুক্ত কথা হাতড়ায়। আর মধুমালা ফের বলে—আমি এক্ষুনি আসব। দৌড়ে যাব—দৌড়ে আসব। তুমি এখানে থাকো।

—যদি ব্যাপারটা সত্যি হয়?

—ফিরে তো আসি। বাবা কী বলেন শুনে আসি! মা কপালীর দিব্যি, ফিরে এসে যেন তোমায় এখানে দেখতে পাই।

মধুমালা পা বাড়াতেই দিব্য বলে—এক সেকেণ্ড!

তারপর সে তখনকার মতো ওকে চুমু খেতে মুখ বাড়ায়, কিন্তু মধুমালা ওর মুখটা ঠেলে সরিয়ে দেয়। বলে—ফিরে এলে, তখন।

সে দৌড়ে চলে যায়। ঘাসজমির ওপর শুকনো পাতা কাঁপিয়ে অলৌকিক হরিণের মতো ছুটে যায় সুকুমারের বোন। দিব্য মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কতক্ষণ পরে তার চমক ভাঙে। একটা সুন্দর স্বপ্ন সদ্য ভেঙে জেগে ওঠার পর কয়েক মুহূর্ত যেমন আবছা বিষণ্ণতা আসে, সেইরকম। দিব্য চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে আরও কিছুক্ষণ।....

তারপর আচমকা শিউরে ওঠে সে। নির্জন বনভূমির স্তব্ধতা, গাছের পাতাও আর কাঁপছে না—সারা অতীতকাল এখানে আটকে গেছে এবং ভবিষ্যৎ বলতে কিছু নেই, এমন এক অদ্ভুত অবস্থা। এই যেন তার মৃত্যু। পিছনে ও চারপাশে অথৈ স্তব্ধতা, সামনে শূন্যতা।

আর মৃত্যুর মুহূর্তে নাকি সমস্ত জীবন মানুষের চোখের সামনে ছবির মতো স্পষ্ট ভেসে ওঠে। দিব্যের পিছনের জীবন স্তব্ধতার একাকার জটিলতা থেকে, বৃত্তরেখা যেভাবে সরলরেখা হয়ে ওঠে, ছিলেছাড়া ধনুকের মত দ্রুত সোজা হচ্ছিল—প্রলম্বিত সময়ের ওপর

বিন্দু বিন্দু রক্তের রঙ ফুটে উঠছিল। সে অসহায় হয়ে তাকিয়ে থাকে। এ কোথায় এসে তার চলার শেষ হল! এমন করে ফুরিয়ে যাবার শূন্যতায় পৌঁছতেই কি সে আজীবন হেঁটে এসেছে?

বাঘনখা গাছটার গুঁড়িতে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরায় সে। তারপর কাঁধের ব্যাগে হাত ভরে। রিভলবারের প্যাকেটটা অনুভব করে। অমনি সে সাহস ফিরে পায়।

প্যাকেটটা শান্ত এলোমেলো সুতো দিয়ে জড়িয়ে রেখেছে। বাফুন! চোয়াল আঁটো হয়ে যায় দিব্যের। দ্রুত সুতো খুলে প্যাকেট থেকে রিভলবার বের করে এবং চারটে কার্তুজই ভরে নেয়। প্যাকেট আর সুতো মুচড়ে দলা পাকিয়ে ঝোপের মধ্যে ফেলে দেয়।

রিভলবারটা অটোমেটিক। সাবধানে এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে একবার ট্রিগার টেপে। একটা গুলি বেরিয়ে যায়। আচমকা নির্জন জঙ্গল ভুতুড়ে শব্দে ছত্রখান হয়। বারুদের কটু গন্ধ এসে ঝাপটা মারে। হ্যাঁ—ঠিকই আছে। ছ'টা কার্তুজের দু'টি নিয়েছে অসীম মজুমদার। একটা নিল কপালীর জঙ্গল। বাকি রইল তিন। হিসেব করে দিতে হবে বাকিগুলো। কে নেবে? সে জানে না। চেনে না তাদের।

কিন্তু কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে সে? সুকুমারের বোন তাকে কি আমৃত্যু দাঁড়িয়ে থাকতে বলে চলে গেল?

রিভলবারটা হঠাৎ যতটা প্রয়োজনীয় মনে হচ্ছিল, আর মনে হচ্ছে না ততটা। তার হাত কাঁপছে। ওজন বেড়ে যাচ্ছে অস্ত্রটার। সে ক্লান্তভাবে বাঁ-হাতের অবশিষ্ট সিগারেট জুতোর তলায় ঘষে নেভাতে গিয়ে দেখে, সুকুর স্লিপারটা পরে আছে। তার জুতো সুকুর মা টের পান নি। জুতোজোড়া খাটের তলায় রয়ে গেছে। তার পরণে মডের পোষাক এখন অথচ পায়ে দীনহীন মানুষের মতো বাজে একটা স্লিপার—নোংরা, ছেঁড়া। একটু বিব্রত বোধ করে। তারপর

রিভলবারটা সাবধানে ব্যাগে ভরে রাখে।

সুকুর বোন তাকে দিব্যি দিয়ে গেছে। মা-কপালীর নামে দিব্যি —আসলে ভালবাসার দিব্যি। সুকুর বোনের সরল হৃদয়টার কথা ভেবে দিব্যের কষ্ট হয়। কোথায় পড়েছিল যেন—কোন বিলিতী বইতে: হোয়েন ইনস্যানিটি কিলস দা ইনোসেন্স···

সে আবার কিটব্যাগ খোলে। নোটবই বের করে। ডটপেন বের করে। একটা পাতা ছিঁড়ে বড় বড় হরফে লেখে: 'খুকু····'

একটু ভাবে। চিঠি লিখতে ইচ্ছে করে না। বরং কবিতার কিছু লাইন। এইরকম অবুঝ ভালবাসার ব্যাপারে, সেটাই শোভন নয় কি? সে ঠোঁটের কোণায় হাসে। স্মরণ করতে থাকে যোগ্য কোন কবিতার পঙ্‌ক্তি। কিছু মনে আসে না এ মুহূর্তে।

স্মৃতি আবার অন্ধকার হয়ে গেছে। ঠোঁট কামড়ে দিব্য ছটফট করে। তারপর আচমকা মনে ছিটকে আসে কয়েকটা লাইন। কিন্তু এ তো ইংরেজি! হো-চি-মিন—নাকি মাও-সে-তুং—কোন বিপ্লবী কবিরই কবিতা, স্মৃতি আবার গোলমাল ক'ছে। 'ইন দা স্প্রিং টাইম উই কেম ইওর গ্রিন ভ্যালি····উই প্রমিজ্‌ড সো····ইন ইওর স্প্রিং টাইম হোয়েন দা রেড ফ্লাওয়ার্স ব্লসম্‌····'

সুকুর বোন স্কুল ফাইনাল পাশ। বুঝবে কি? অগত্যা সে বাংলা করে লেখে: 'তোমার বসন্তদিনে····'

পরের শব্দটা ভাবার মুহূর্তে পিছনে কোথাও ঝোপের আড়াল থেকে কে তাকে ভারি গলায় ডাকে— দিব্যেন্দুবাবু!

ডটপেন দাগটানা ছোট্ট কাগজ থেকে মুখ তোলে। দিব্য দ্রুত ঘোরে এবং দীর্ঘ সময়ের অভ্যাসজাতবোধে, সংস্কারে, মুহূর্তে চঞ্চল ও ক্ষিপ্র সে—কলম ও কাগজটা ফেলে দিয়ে রিভলবার বের করে।

অন্যদিক থেকে আবার জোরালো আওয়াজ আসে—দিব্যেন্দুবাবু! ওটা ফেলে দিন!

দিব্যেন্দু ঘুরতেই আরেকদিক থেকে কে দৌড়ে আসে এবং চিৎকার করে—হ্যাণ্ড্‌স্ আপ্‌!

দিব্য তিনদিকে তিনটে কার্তুজ পাঠিয়ে দেয়। স্তব্ধতা খান খান হয়ে যায়। পাখিরা কোথাও চুপচাপ ঝিমুচ্ছিল। তুমুল চেঁচামেচি জুড়ে দেয়। তারপরই তার ডান হাতে গুলি লাগে। আবার গুলির শব্দ এবং বারুদের ঝাঁঝালো গন্ধে কপালীর জঙ্গল কটু হয়ে যায়। রিভলবারটা পড়ে যায়। দিব্য বাঁ-হাতে ডান হাত চেপে ধরে পাগলের মতো গর্জন করে ওঠে—বাষ্টার্ড্‌।

না, গুলিতে জখম হবার যন্ত্রণায় নয়—সুকুর বোনকে পুরো বাক্যটা লিখতে পারেনি বলে। তার চারদিকে শুকনো পাতায় প্রচণ্ড আওয়াজ হতে থাকে। কারা আসে, সে মুখ তুলে দেখে না।.....

মধুমালা উবুড় হয়ে শুয়েছিল। চোখমুখ ফুলো দেখাচ্ছিল। খিড়কি দিয়ে ঢুকতেই মন্দিরা তাকে প্রচণ্ড মেরেছেন। ঘরে বন্ধ করে রেখেছেন। খেতে দেন নি। জীবনে এই প্রথম শাস্তি মধুমালার।

বিকেলে দরজা খুলে সুকুমার বোনের কাছে এল। তার গায়ে তখনও জ্বর। হাঁফাচ্ছে। আসতে কষ্ট হয়েছে তার। গলার কাছে হাত রেখে ডাকে—খুকু!

গরম হাতের ছোঁয়ায় চামড়া পুড়ে যায় মধুমালার। কিন্তু ঘোরে না।

কয়েকবার ডাকার পর সে সাড়া দেয়—কী?

সুকুমার চাপা স্বরে বলে—মদন কপালীর জঙ্গলে গিয়েছিল। এই কাগজটা কুড়িয়ে এনেছে। দেখ্‌তো, হয়তো তোরই।

মধুমালা ঘুরে দোমড়ানো কাগজটা দেখে বলে—না। আমার না।

—হ্যাঁ। ওটা তোর। মানে—দিব্য লিখেছে তোকে।

মধুমালা চুপ করে থাকে। সুকুমার কাগজটা ওর হাতে গুঁজে দিয়ে উঠে দাঁড়ায। কিছু বলবে ভাবে—বোনকে কিছু সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু পারে না। আস্তে আস্তে চলে যায় সে। এক পায়েব শব্দ মিলিয়ে গেলে উবুড় হয়ে শুয়ে থেকেই মধুমালা লাল চোখে কাগজটা দেখে। 'খুকু, তোমার বসন্তদিনে....'

কী? আমাব বসন্তদিনে কি? মধুমালা মনে মনে মাথা কোটে! তারপর দেখে, তারই চোখের জলে হরফগুলো ভিজে আবছা হয়ে যাচ্ছে। যে সাদা প্রজাপতিটা কাল কপালীব জঙ্গলে সে পিষে মেরেছিল, ঠিক সেই বকম।....